يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ط

তা'লীমুল ইসলাম

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড

মূল ঃ

হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ্ (রাহ্ঃ)

অনুবাদ ঃ

মাওলানা সৈয়্যদ মোহাম্মদ জহীরুল হক

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও অনুবাদক

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার ঃ ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা
এর পক্ষে মোঃ আবদুল হালিম
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশক কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পুনর্মুদ্রণ-২
অক্টোবর ২০০৯ ইং

হাদিয়া ঃ ৯০.০০ টাকা মাত্র

করিমিয়া প্রেস, ৫/১, গিরদে উর্দু রোড, ঢাকা হইতে
এম, এ, হালিম কর্তৃক মুদ্রিত

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আযান	৬
তাকবীর	৮
সানা	৮
তা'আওউয	৯
তাস্‌মিয়া	৯
সূরা ফাতেহা বা আল্‌হামদু শরীফ	৯
সূরা কাউসার	৯
সূরা এখলাস	১০
সূরা ফালাক	১০
সূরা নাস	১০
রুকূর তস্‌বীহ	১১
কওমাহ্‌র তাসমী'	১১
কওমাহ্‌র তাহমীদ	১১
সজদার তাস্‌বীহ	১১
তাশাহ্‌হুদ বা আত্তাহিয়্যাত	১১
দুরূদ শরীফ	১২
দুরূদ শরীফের পরবর্তী দো'আ	১২
সালাম	১২
নামায শেষের মোনাজাত	১৩
দো'আয়ে কুনূত	১৩
ওযূ করার নিয়ম	১৩
নামায পড়ার নিয়ম	১৪
দ্বিতীয় খণ্ড	
প্রথম পর্ব	১৯
তা'লীমুল ঈমান বা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস	১৯
আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস	২১
মালা-ইকা বা ফেরেশতাগণ	২২
আল্লাহ্‌ তা'আলার কিতাবসমূহ	২২
আল্লাহ্‌র রাসূল তথা পয়গম্বর (আঃ)	২৩
কিয়ামতের বিবরণ	২৪
তক্‌দীরের বিবরণ	২৫
মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া	২৫
দ্বিতীয় পর্ব	২৭
তা'লীমুল আরকান বা ইসলামী কর্ম	২৭
নামায	২৭
নামাযের প্রথম শর্তের বিবরণ	২৮
ওযূর বিবরণ	২৯
গোসলের বিবরণ	৩০
মোজার উপর মাসেহ করা	৩১
চটার উপর মাসেহ করার বিবরণ	৩২
বস্তুগত বা স্থূল নাপাকীর বিবরণ	৩৩
এস্তেন্‌জা বা শুচিতার বিবরণ	৩৪
পানির বিবরণ	৩৫
কুয়ার বিবরণ	৩৬
তৃতীয় খণ্ড	
প্রথম পর্ব	৩৯
তা'লীমুল ঈমান বা ইসলামী আকায়েদ	৩৯
তওহীদ বা একত্ববাদ	৩৯
মালা-ইকা (ফেরেশতাগণ)	৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবসমূহ .	৪৪
রেসালাত	৪৬
সাহাবায়ে কেরামের বিবরণ ...	৫০
বেলায়েত ও ওলীআল্লাহ্গণের বিবরণ	৫১
মু'জেযা ও কারামতের বিবরণ ..	৫২
দ্বিতীয় পর্ব	৫৬
তা'লীমুল আরকান বা ইসলামী আমলসমূহ	৫৬
ওযূর অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ ...	৫৬
ওযূর ফরয সংক্রান্ত অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ	৫৭
ওযূর সুন্নত সংক্রান্ত অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ	৫৮
ওযূর অবশিষ্ট মুস্তাহাব বিষয়সমূহ	৬০
ওযূ ভাঙ্গার অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ	৬১
গোসলের অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ	৬৩
মোজার উপর মাসেহ্ করার অন্যান্য মাসআলা	৬৪
নাজাসাতে হাকীকিয়্যাহ ও তার পবিত্রতার অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ	৬৫
এস্তেঞ্জার অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ	৬৭
পানি সংক্রান্ত অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ	৬৭
কুয়ার অবশিষ্ট মাসআলা	৬৯
তাইয়াম্মুমের বিবরণ	৬৯
নামাযের দ্বিতীয় শর্ত–কাপড় পাক হওয়ার বিবরণ	৭৩
নামাযের তৃতীয় শর্ত–জায়গা পাক হওয়ার বিবরণ	৭৩
নামাযের চতুর্থ শর্ত–সতর ঢাকার বিবরণ	৭৪
নামাযের পঞ্চম শর্ত–সময়ের বিবরণ	৭৫
নামাযের ষষ্ঠ শর্ত–এস্তেকবালে কেবলার বিবরণ	৭৯
নামাযের সপ্তম শর্ত–নিয়তের বিবরণ	৭৯
আযানের বিবরণ	৮০
নামাযের আরকানের বিবরণ ...	৮৩
তাকবীরে তাহ্রীমার বিবরণ ...	৮৩
নামাযের প্রথম রুকন–কেয়ামের বিবরণ	৮৪
নামাযের দ্বিতীয় রুকন–কেরাআতের বিবরণ	৮৪
নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রুকন রুকূ ও সজদার বিবরণ	৮৫
নামাযের পঞ্চম রুকন–কা'দায়ে আখীরার বিবরণ	৮৬
নামাযের ওয়াজিব বিষয়সমূহের বিবরণ	৮৭
নামাযের সুন্নতসমূহের বিবরণ ..	৮৮
নামাযের মুস্তাহাব বিষয়সমূহের বিবরণ	৮৯
নামায পড়ার পুরো নিয়ম	৮৯
চতুর্থ খণ্ড	
প্রথম পর্ব	৯৩
ঈমানের শিক্ষা বা ইসলামী আকায়েদ	৯৩
তওহীদ	৯৩
আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবসমূহ .	৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠা

রেসালাত ১০০
ঈমান ও আ'মালে সালেহার বিবরণ ১০৪
মা'সিয়াত ও গোনাহ্র বিবরণ .. ১০৫
কুফ্র ও শির্কের বিবরণ ১০৬
বেদআতের বিবরণ ১০৮
অন্যান্য গোনাহ্র বিবরণ ১০৯
দ্বিতীয় পর্ব ১১২
আরকান শিক্ষা বা ইসলামী আমল ১১২
কেরাআতের কয়েকটি হুকুমের বিবরণ ১১২
জামাআত ও ইমামতের বিবরণ . ১১৪
মুফসেদাতে নামাযের বিবরণ ... ১১৬
নামাযের মাকরূহসমূহের বিবরণ ১১৭
বিত্র নামাযের বিবরণ ১১৯
সুন্নত ও নফল নামাযের বিবরণ ১২০
তারাবীহ্র নামাযের বিবরণ ১২১
নামাযের কাযা পড়ার বিবরণ ... ১২২
মুদরিক, মসবূক ও লাহিক-এর বিবরণ ১২৪
স্জদায়ে সহুর বিবরণ ১২৬
সজদায়ে তেলাওয়াতের বিবরণ . ১২৮
রুগ্ন ব্যক্তির নামাযের বিবরণ .. ১২৯
মুসাফিরের নামাযের বিবরণ ... ১৩০
জুমুআর নামাযের বিবরণ ১৩২
দুই ঈদের নামাযের বিবরণ ... ১৩৪
জানাযার নামাযের বিবরণ ১৩৭
ইসলামী ফরযসমূহের মধ্য থেকে রোযার বিবরণ ১৩৮
রমযান শরীফের রোযার বিবরণ ১৪০
চাঁদ দেখা ও তার সাক্ষ্যের বিবরণ ১৪১
নিয়তের বিবরণ ১৪৩
রোযার মুস্তাহাব বিষয়সমূহের বিবরণ ১৪৩
রোযার মাকরূহসমূহের বিবরণ . ১৪৪
রোযা ভাঙ্গার কারণসমূহ ১৪৫
রোযার কাযার বিবরণ ১৪৬
কাফ্ফারার বিবরণ ১৪৭
এ'তেকাফের বিবরণ ১৪৮
এ'তেকাফের মুস্তাহাব বিষয়সমূহ ১৫০
এ'তেকাফের সময় ১৫০
এ'তেকাফে জায়েয বিষয়সমূহের বিবরণ ১৫০
এ'তেকাফের মাকরূহ ও ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের বিবরণ ১৫১
নযর বা মান্নতের বিবরণ ১৫২
যাকাতের বিবরণ ১৫২
যাকাতের মাল ও নেসাবের বিবরণ ১৫৩
যাকাত পরিশোধের বিবরণ ... ১৫৫
মাসারিফে যাকাত বা যাকাতের খাতসমূহ ১৫৭
সদকায়ে ফিৎরের বিবরণ ১৫৯

তা'লীমুল ইসলাম

প্রথম খণ্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

نحمد الله العلى العظيم ونصلى على رسوله الكريم

প্রশ্ন ঃ তুমি কে ? (অর্থাৎ, ধর্মের দিক দিয়ে তোমার নাম কি ?)

উত্তর ঃ মুসলমান।

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের মযহাবের (অর্থাৎ, ধর্মের) নাম কি ?

উত্তর ঃ ইসলাম।

প্রশ্ন ঃ ইসলাম কি শিক্ষা দেয় ?

উত্তর ঃ ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ্ এক। উপাসনার যোগ্য একমাত্র তিনিই। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা ও রাসূল। কোরআন শরীফ আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব। ইসলাম সত্য ধর্ম। দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণকর ও ভাল বিষয় ইসলাম শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন ঃ ইসলামের কালেমা কি ?

উত্তর ঃ ইসলামের কালেমা হল এই ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া এবাদত বা উপাসনার যোগ্য কেউ নেই। মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল।

এ কালেমাকে কালেমায়ে তায়্যেবা এবং কালেমায়ে তওহীদ বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ কালেমায়ে শাহাদত কি ?

উত্তর ঃ কালেমায়ে শাহাদত হল এই ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ *

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল।

প্রশ্ন ঃ ঈমানে মুজ্‌মাল কি ?

উত্তর ঃ ঈমানে মুজ্‌মাল হল এই ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ *

অর্থ ঃ আমি ঈমান এনেছি (বিশ্বাস স্থাপন করেছি) আল্লাহ্‌র উপর যেমন তিনি তাঁর নাম ও গুণাবলীসহ রয়েছেন। আর আমি তাঁর সমস্ত নির্দেশ মেনে নিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ ঈমানে মুফাস্‌সাল কি ?

উত্তর ঃ ঈমানে মুফাস্‌সাল হল এই ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ
خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ *

অর্থ ঃ আমি ঈমান এনেছি (বিশ্বাস স্থাপন করেছি) আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, কিয়ামত দিবসের উপর এবং এ বিষয়ের উপর যে, ভাল ও মন্দ তকদীর (নিয়তি) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর ঈমান এনেছি মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত করার উপর।

প্রশ্ন ঃ তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন ?

উত্তর ঃ আমাদেরকে এবং আমাদের পিতা-মাতা, আসমান-যমীন এবং সকল সৃষ্টবস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন ?

উত্তর ঃ নিজের ক্ষমতা ও নির্দেশের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন ঃ যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করে, তাদেরকে কি বলা হয় ?

উত্তর ঃ তাদেরকে কাফের বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ছাড়া অন্যান্য বস্তুর পূজা করে, যেমন হিন্দুরা মূর্তিপূজা করে, তাদেরকে কি বলা হয় ?

উত্তর ঃ এ সব ধরনের লোকদেরকে কাফের ও মুশরিক বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ যারা দু'তিনজন খোদা মানে, যেমন, খৃস্টানরা তিন খোদা মানে, তাদেরকে কি বলা হয় ?

উত্তর ঃ তাদেরকেও কাফের ও মুশরিক বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ মুশরিকরা (পরকালে) মুক্তি পাবে কিনা ?

উত্তর ঃ মুশরিকরা মুক্তি পাবে না; তারা চিরকাল কষ্ট ও আযাবে থাকবে।

প্রশ্ন ঃ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ছিলেন ?

উত্তর ঃ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা এবং তাঁর রাসূল ও পয়গম্বর ছিলেন। আমরা তাঁরই উম্মত।

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

উত্তর ঃ আরব দেশে মক্কা শরীফ নামে একটি নগরী রয়েছে। তিনি সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ঃ তাঁর পিতা ও পিতামহের নাম কি ছিল ?

উত্তর ঃ তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ্ আর পিতামহের নাম আব্দুল মুত্তালিব ছিল।

প্রশ্ন ঃ আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্যাদার দিক দিয়ে অন্যান্য নবী অপেক্ষা বড় নাকি ছোট ?

উত্তর ঃ আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্যাদার দিক দিয়ে সমস্ত নবী অপেক্ষা বড় এবং আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা মহান।

প্রশ্ন ঃ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সমস্ত জীবন কোথায় অতিবাহিত করেছেন ?

উত্তর ঃ তেপ্পান্ন বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মক্কা নগরীতে অবস্থান করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে মদীনা মুনাওওয়ারায় চলে যান এবং দশ বছর সেখানে অবস্থান করে তেষট্টি বছর বয়সে ওফাত পান।

প্রশ্ন ঃ যারা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানে না, তারা কেমন ?

উত্তর ঃ যারা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্র রাসূল হিসেবে মানে না, তারাও কাফের।

প্রশ্ন ঃ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানা বা স্বীকার করার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানার অর্থ হল এই যে, তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত রাসূল বলে বিশ্বাস করবে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা তাঁকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম জানবে, তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণ করবে এবং তাঁর নির্দেশাবলীর আনুগত্য করবে।

প্রশ্ন ঃ একথা কি করে জানা গেল যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার নবী ?

উত্তর ঃ তিনি এমন ভাল কাজ করেছেন এবং এমন সব বিষয় দেখিয়েছেন ও বলেছেন, যা নবীগণ ছাড়া অন্য কেউ দেখাতে কিংবা বলতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ একথা কিভাবে জানা গেল যে, কোরআন শরীফ আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ?

উত্তর ঃ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, কোরআন শরীফ আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব এবং তিনি তা আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ কোরআন মজীদ কি হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি একবারে অবতীর্ণ হয়েছে, নাকি অল্প অল্প করে ?

উত্তর ঃ অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। কখনও এক আয়াত কখনও দু'চার আয়াত, কখনও এক সূরা; যেমন যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন তেমন অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কত দিনে সমগ্র কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে ?

উত্তর ঃ তেইশ বছরে।

প্রশ্ন ঃ কোরআন মজীদ কেমন করে অবতীর্ণ হত ?

উত্তর ঃ হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আয়াত কিংবা সূরা পড়ে শোনাতেন আর তিনি তা শুনে মুখস্থ করে নিতেন এবং কোন লেখককে ডেকে লিখিয়ে রাখতেন।

প্রশ্ন ঃ তিনি নিজে কেন লিখতেন না ?

উত্তর ঃ এ জন্য যে, তিনি উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ উম্মী কাকে বলে ?

উত্তর ঃ যে কারো কাছে লেখাপড়া শিখে নাই, তাকে উম্মী (বা নিরক্ষর) বলা হয়। যদিও দুনিয়াতে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো কাছে

জ্ঞানচর্চা করেন নি; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক জ্ঞান দান করেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে ছিলেন ?

উত্তর ঃ তিনি একজন ফেরেশতা। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম (নির্দেশাবলী) নবী-রাসূলগণের কাছে নিয়ে আসতেন।

প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার বন্দেগী করে ?

উত্তর ঃ তারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, মালের যাকাত দেয় এবং হজ্জ আদায় করে।

প্রশ্ন ঃ নামায কাকে বলে ?

উত্তর ঃ নামায হল আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত ও বন্দেগী করার একটি বিশেষ পদ্ধতি, যা আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে এবং হযরত রাসূলে করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীসে মুসলমানদেরকে শিখিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ এবাদত বন্দেগীর যে পদ্ধতিকে নামায বলা হয়, সেটি কি ?

উত্তর ঃ ঘরে কিংবা মসজিদে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ান। কোরআন শরীফ পাঠ করা, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করা, তাঁর প্রতি মহত্ত্ব ও সম্মান প্রদর্শন করা। তাঁর সামনে অবনত হওয়া এবং মাটিতে মাথা রেখে তাঁর বড়ত্ব ও নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করা।

প্রশ্ন ঃ মসজিদে নামায পড়লে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সামনে দাঁড়ায়, নাকি ঘরে ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সবখানেই সামনে থাকেন, তা মসজিদেই নামায পড়ুক কিংবা বাড়িতে। কিন্তু মসজিদে নামায পড়লে অনেক বেশী সওয়াব হয়।

প্রশ্ন ঃ নামায পড়ার পূর্বে যে হাত, মুখ ও পা ধোয়া হয়, তাকে কি বলে ?

উত্তর ঃ তাকে ওযূ বলা হয়। ওযূ ছাড়া নামায হয় না।

প্রশ্ন ঃ নামাযে কোন্ দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হয় ?

উত্তর ঃ পশ্চিম দিকে— যেদিকে সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়।

প্রশ্ন ঃ পশ্চিম দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হল কেন ?

উত্তর ঃ মক্কা মুআয্যমায় আল্লাহ্ তা'আলার একখানা ঘর রয়েছে। তাকে কা'বা বলা হয়। নামাযে সে ঘরের দিকে মুখ করা জরুরী। আর সেটি

আমাদের দেশ থেকে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সে জন্য পশ্চিম দিকে মুখ করে নামায পড়া হয়।

প্রশ্ন ঃ যেদিকে মুখ করে নামায পড়া হয়, সেটিকে কি বলা হয়?

উত্তর ঃ সেটিকে কেবলা বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ দিনরাতে কতবার নামায পড়া হয়?

উত্তর ঃ দিনরাতে পাঁচবার নামায পড়া ফরয।

প্রশ্ন ঃ পাঁচ বেলার নামাযের নাম কি?

উত্তর ঃ প্রথম ফজরের নামায, যা ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়া হয়।
দ্বিতীয় যুহরের নামায, যা দুপুরে সূর্য (মাথার উপর থেকে) ঢলে পড়ার পর পড়া হয়।
তৃতীয় আসরের নামায, যা সূর্যাস্তের দেড় দু'ঘন্টা পূর্বে পড়তে হয়।
চতুর্থ মাগরিবের নামায, যা সূর্যাস্তের পর পড়া হয়।
পঞ্চম এশার নামায, যা দেড়-দু'ঘন্টা রাত অতিবাহিত হওয়ার পর পড়া হয়।

প্রশ্ন ঃ আযান কাকে বলে?

উত্তর ঃ নামাযের সময় হওয়ার পর নামাযের কিছুক্ষণ পূর্বে একজন লোক দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে নিম্নের শব্দগুলো উচ্চারণ করেন ঃ

আযান

اَللّٰهُ اَكْبَرُ * اَللّٰهُ اَكْبَرُ * اَللّٰهُ اَكْبَرُ * اَللّٰهُ اَكْبَرُ * اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ * اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ * اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ * اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ * حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ * حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ * حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ * حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ * اَللّٰهُ اَكْبَرُ * اَللّٰهُ اَكْبَرُ * لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ *

অর্থ ঃ আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্

ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল। নামাযের জন্য আসুন, নামাযের জন্য আসুন। সফলতার দিকে আসুন, সফলতার দিকে আসুন। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

এ বাক্যগুলোকে আযান বলা হয়। ভোরের আযানে হাইয়্যা আলাল ফালাহ্-এর পর اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (ঘুম অপেক্ষা নামায উত্তম) বাক্যটিও দু'বার উচ্চারণ করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ তাকবীর কাকে বলে ?

উত্তর ঃ নামাযে দাঁড়ানোর সময় নামায শুরু করার আগে একজন লোক উঠে সে সব বাক্যই বলতে থাকেন, যেগুলো আযানে বলা হয়। তাকেই একামত কিংবা তাকবীর বলা হয়। তাকবীরে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পরে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (নামায শুরু হতে যাচ্ছে) কথাটি দু'বার আযানের বাক্যের অতিরিক্ত বলতে হয়।

প্রশ্ন ঃ যে লোকটি আযান কিংবা তাকবীর বলে, তাঁকে কি বলা হয় ?

উত্তর ঃ যে লোক আযান দেয়, তাঁকে মুয়ায্যিন আর যে লোক তাকবীর বলে, তাঁকে মুকাব্বির বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ অনেক লোক একত্রে মিলে যে নামায পড়ে, সে নামাযকে, যে নামায পড়ায় তাঁকে এবং যারা নামায পড়ে তাঁদেরকে কি বলা হয় ?

উত্তর ঃ অনেক মানুষ মিলেমিশে একত্রে যে নামায পড়ে, তাকে জামাআতের নামায বলা হয়। আর যিনি নামায পড়ান তাঁকে ইমাম এবং যাঁরা তাঁর পেছনে নামায পড়েন, তাঁদেরকে মুক্তাদী বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ যে লোক একা নামায পড়ে তাকে কি বলে ?

উত্তর ঃ একা নামায আদায়কারীকে মুন্‌ফারিদ বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ যে ঘর বিশেষভাবে নামায পড়ার জন্য তৈরী করা হয় এবং তাতে জামাআতের সাথে নামায হয়, তাকে কি বলা হয় ?

উত্তর ঃ তাকে মসজিদ বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ মসজিদে গিয়ে কি করা উচিত ?

উত্তর ঃ মসজিদে নামায পড়বে, কোরআন তেলাওয়াত করবে, কোন ওযীফা পাঠ করবে কিংবা আদবের সাথে নিশ্চুপ বসে থাকবে। মসজিদে খেলা-ধুলা কিংবা হৈহল্লা করা অত্যন্ত খারাপ।

প্রশ্ন ঃ নামায পড়লে কি লাভ হয় ?

উত্তর ঃ নামায পড়াতে বহু লাভ। সংক্ষেপে তোমাদেরকে তার কয়েকটি বলে দিচ্ছি ঃ

(১) নামাযী লোকের শরীর ও পোশাকাশাক পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।

(২) নামাযী লোকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা খুশী ও সন্তুষ্ট হন।

(৩) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযীর প্রতি খুশী ও সন্তুষ্ট হন।

(৪) নামাযী ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী হয়ে যায়।

(৫) সৎলোকেরা দুনিয়াতেও নামাযীকে সম্মান করেন।

(৬) নামাযী ব্যক্তি বহু রকম গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে।

(৭) মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলা নামাযীকে সুখে ও শান্তিতে রাখেন।

প্রশ্ন ঃ নামাযের মধ্যে যাকিছু পড়তে হয়, সেগুলোর নাম ও পাঠ কি কি ?

উত্তর ঃ নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাকিছু পড়া হয়, সেগুলোর নাম ও বাক্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

তাকবীর

اَللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহ্ মহান

সানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ *

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমরা তোমার পবিত্রতা স্বীকার করছি, তোমার প্রশংসা

করছি, তোমার নাম অত্যন্ত বরকতময়, তোমার মর্যাদা অতি উন্নত এবং তোমাকে ছাড়া কেউ এবাদতের যোগ্য নয়।

তা'আওউয

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ *

অর্থ ঃ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ চাইছি।

তাস্‌মিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যিনি বড়ই দয়ালু ও করুণাময়।

সূরা ফাতেহা বা আল্‌হামদু শরীফ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ﴿﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ؕ﴿﴾

অর্থ ঃ যাবতীয় প্রশংসা সমস্ত পৃথিবীর পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি বড়ই করুণাময়, অত্যন্ত দয়ালু। তিনি বিচার-দিবসের মালিক। (হে আল্লাহ্!) আমরা শুধুমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং শুধু তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথে চালাও; এমন লোকদের পথে, যাঁদের প্রতি তুমি কল্যাণ বর্ষণ করেছ। তাদের পথে নয়, যাদের উপর তোমার গযব অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট।

সূরা কাউসার

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ؕ﴿﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ؕ﴿﴾ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴿﴾

অর্থ ঃ (হে নবী!) আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। সুতরাং আপনি নিজের পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। নিঃসন্দেহে আপনার শত্রুরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সূরা এখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

অর্থ ঃ (হে নবী!) বলে দিন, তিনি (অর্থাৎ) আল্লাহ্ এক এবং একক, আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কারো জনক নন এবং কারো জাতকও নন। আর তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।

সূরা ফালাক

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۚ

অর্থ ঃ (হে নবী! দো'আ করতে গিয়ে) বলুন, আমি ভোরের প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করছি সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে এবং অন্ধকার যখন বিস্তার লাভ করে সে অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে এবং গিঁটে ফুৎকারকারিণী রমণীর অনিষ্ট থেকে এবং হিংসাপরায়ণের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসান্বিত হয়ে পড়ে।

সূরা নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۚ

অর্থ ঃ (হে নবী! দো'আ করতে গিয়ে) বলুন, আমি মানুষের পালনকর্তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি মানুষের অধিপতি সম্রাট, যিনি মানুষের উপাস্য, (তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি) আত্মগোপনকারী প্ররোচকের অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, তা সে জিনদের মধ্যেই হোক কিংবা মানুষের মধ্যে।

রুকূর তাস্‌বীহ্‌— (অবনত অবস্থায় পড়বে)

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ

অর্থ ঃ পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমার মহান পালনকর্তার।

কওমাহ্‌র তাসমী'— (রুকূ থেকে দাঁড়াবার সময় পড়বে)

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌ (তার কথা) শুনে নিয়েছেন, যে তাঁর প্রশংসা করেছে।

কওমাহ্‌র তাহ্‌মীদ— (রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে পড়বে)

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

অর্থ ঃ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য।

সজদার তাস্‌বীহ্‌— (মাটিতে মাথা রাখা অবস্থায় পড়বে)

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى

অর্থ ঃ পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমার মহান পালনকর্তার।

তাশাহ্‌হুদ বা আত্তাহিয়্যাত

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰةُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ
وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ
اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ *

অর্থ ঃ যাবতীয় বাচনিক ও দৈহিক এবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত। হে নবী! আপনার প্রতি বর্ষিত হোক শান্তি এবং আল্লাহ্‌র করুণা ও বরকত। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর ও আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল।

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ط اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় মহান। হে আল্লাহ্! বরকত নাযিল করুন মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেমন বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় মহান।

দুরূদ শরীফের পরবর্তী দো'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ *

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি আমার নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি এবং এতে সন্দেহ নেই যে, তুমি ছাড়া গোনাহ্ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব, তুমি নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমার মাধ্যমে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি রহম কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাকারী, বড় করুণাময়।

সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

অর্থ ঃ তোমাদের উপর সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক।

নামায শেষের মোনাজাত

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبٰرَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ *

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমিই নিরাপত্তা দানকারী এবং তোমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা (লাভ হতে পারে)। তুমি মহা বরকতময় হে মহত্ত্ব ও মহিমার আধার!

দো'আয়ে কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ

وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ

يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ

وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ *

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে সাহায্য কামনা করি, তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার প্রতি ঈমান স্থাপন করি ও তোমার উপর নির্ভর করি। তোমার উত্তম প্রশংসা করি এবং তোমার শুকরিয়া আদায় করি; তোমার নাশুকরী করি না। আমরা বিচ্ছিন্ন করে দেই এবং পরিহার করি সে ব্যক্তিকে, যে তোমার নাফরমানী করে। হে আল্লাহ্! আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমার জন্যই নামায পড়ি ও সজদা করি এবং তোমার দিকেই ধাবিত হই। তোমারই রহমত কামনা করি এবং তোমার শাস্তির ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাব কাফেরদের উপর আপতিত হবে।

ওযূ করার নিয়ম

প্রশ্ন ঃ ওযূ কিভাবে করতে হয় ?

উত্তর ঃ পরিষ্কার পাত্রে পাক পানি নিয়ে পাক উঁচু জায়গায় বসবে। কেবলামুখী হয়ে বসতে পারলে ভাল। তা সম্ভব না হলেও কোন ক্ষতি নেই। জামার আস্তিন কনুই পর্যন্ত তুলে নেবে। তারপর বিস্‌মিল্লাহ পড়বে। তিনবার কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত ধোবে। অতঃপর তিনবার কুল্লি করবে। মেস্‌ওয়াক হাতের কাছে না থাকলে আঙ্গুল দ্বারা দাঁত মেজে নেবে।

তারপর তিনবার নাকে পানি দিয়ে বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে নাক পরিষ্কার করবে। এরপর তিনবার মুখ ধোবে। মুখের উপর সজোরে পানি নিক্ষেপ করবে না; বরং আস্তে আস্তে কপালে পানি দিয়ে কপালের চুল থেকে চিবুক বা থুতনি পর্যন্ত এবং দু'পাশে উভয় কান পর্যন্ত মুখ ধোয়া কর্তব্য। তারপর কনুই সমেত উভয় হাত ধোবে। প্রথমে ডান হাত তিনবার এবং পরে বাঁ হাত তিনবার ধোয়া উচিত। অতঃপর হাত পানিতে ভিজিয়ে মাথা, কান ও ঘাড় মসেহ করবে। মসেহ কেবল একবার করে করবে। সবশেষে উভয় পা তিন তিনবার করে ধোবে। প্রথমে ডান পা ও পরে বাঁ পা ধোয়া উচিত।

নামায পড়ার নিয়ম

প্রশ্ন ঃ নামায পড়ার নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ নামায পড়ার নিয়ম নিম্নরূপ ঃ

ওযূ করার পর পাক-পবিত্র কাপড় পরে পাক জায়গায় কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। নামাযের নিয়ত করে উভয় হাত দু'কান পর্যন্ত তুলে নেবে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে উভয় হাত নাভির নীচে বাঁধবে। ডান হাত বাঁ হাতের উপরে থাকবে। নামাযের মাঝে এদকি ওদিক তাকাবে না। একান্ত আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ্র প্রতি খেয়াল রাখবে। হাত বাঁধার পর সানা অর্থাৎ,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ *

(সুব্হানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুক) পাঠ করবে। অতঃপর اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ। (আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম) ও بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। (বিস্-মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম) পড়ে আল্ হামদু শরীফ পাঠ করবে। আল্হামদু শেষে নিঃশব্দে 'আমীন' বলবে। অতঃপর সূরা এখলাস কিংবা অন্য কোন সূরা যা-ই মনে থাকে পড়বে। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূতে নুয়ে পড়বে। রুকূতে দু'হাতে

দু'হাঁটু আঁকড়ে ধরবে এবং তিন বা পাঁচবার রুকূর তাস্‌বীহ্ অর্থাৎ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ (সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আযীম) পাঠ করার পর তাসমী' অর্থাৎ, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলতে বলতে সোজা উঠে দাঁড়াবে। সাথে সাথে তাহ্‌মীদ অর্থাৎ, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ)-ও পড়ে নেবে। অতঃপর তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতে বলতে এভাবে সজদায় যাবে—প্রথমে উভয় হাঁটু মাটিতে রাখবে। তারপর উভয় হাত রাখবে অতঃপর উভয় হাতের মাঝখানে প্রথমে নাক ও পরে কপাল মাটিতে রাখবে। এরপর সজদার তাস্‌বীহ্ অর্থাৎ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) তিন বা পাঁচবার পড়বে। তারপর তাকবীর বলতে বলতে উঠবে এবং সোজা বসে যাবে। অতঃপর তাকবীর বলতে বলতে অনুরূপভাবে দ্বিতীয় সজদা করবে। তারপর তাকবীর বলতে বলতে দাঁড়িয়ে যাবে। উঠার সময় মাটিতে হাতের ঠেস দেবে না। সজদা পর্যন্ত এক রাকআত পূর্ণ হল। এবার শুরু হল দ্বিতীয় রাকআত। তাস্‌মিয়া পড়ে আলহামদু শরীফ পড়বে এবং অন্য কোন সূরা মেলাবে। তারপর যথারীতি রুকূ, কওমাহ্ ও দু'টি সজদা করে উঠে বসবে। তারপর প্রথমে তাশাহ্‌হুদ অতঃপর দুরূদ শরীফ ও পরে দো'আ পড়বে। অতঃপর সালাম ফেরাবে প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাঁ দিকে। সালাম ফেরাবার সময় ডান ও বাঁ দিকে ('আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্' বলে) মুখ ঘোরাবে। এভাবে দু'রাকআত নামায পূর্ণ হল। সালাম ফেরাবার পর হাত তুলে

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا

الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ *

(আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালামু ওয়া মিনকাস্‌সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল্ জালালি ওয়াল ইকরাম) দো'আ পাঠ করবে। দো'আর সময় হাত খুব বেশী উপরে উঠাবে না, অর্থাৎ কাঁধ থেকে উঁচু করবে না। দো'আ শেষ করে উভয় হাত মুখের উপর ফেরাবে।

প্রশ্ন ঃ উভয় সজদার মাঝে এবং তাশাহ্হুদ পড়ার অবস্থায় কিভাবে বসা উচিত?

উত্তর ঃ ডান পা খাড়া করে রাখবে এবং তার আঙ্গুলগুলো কেবলার দিকে থাকবে এবং বাঁ পা বিছিয়ে তার উপর বসে যাবে। বসা অবস্থায় উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ইমাম, মুন্ফারিদ ও মুক্তাদীর নামাযে কোন পার্থক্য আছে কিনা ?

উত্তর ঃ হাঁ, ইমাম, মুন্ফারিদ ও মুক্তাদীর নামাযে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তা হল এই যে, ইমাম ও মুন্ফারিদ প্রথম রাকআতে সানার পর আউযুবিল্লাহ ও বিস্মিল্লাহ পড়ে আল্হামদু শরীফ ও সূরা পাঠ করে থাকে এবং দ্বিতীয় রাকআতে বিস্মিল্লাহ, আল্হামদু শরীফ ও সূরা পড়ে। কিন্তু মুক্তাদীকে শুধু প্রথম রাকআতে সানা পড়ার পর উভয় রাকআতেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, রুকূ থেকে উঠার সময় ইমাম ও মুন্ফারিদ বলেন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্'। মুন্ফারিদ অবশ্য তাসমী'-এর সাথে 'তাহ্মীদ' অর্থাৎ, 'রাব্বানা লাকাল হামদ'-ও বলতে পারেন। কিন্তু মুক্তাদীকে শুধু তাহ্মীদ অর্থাৎ, 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বলতে হয়।

প্রশ্ন ঃ নামায তিন অথবা চার রাকআত পড়তে হলে কেমন করে পড়তে হবে ?

উত্তর ঃ দু'রাকআত তো তেমনিভাবে পড়তে হবে যেমন উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু 'কা'দাহ্' বা বসার মাঝে 'আত্তাহিয়্যাত' ও 'তাশাহ্হুদ'-এর পর দুরূদ শরীফ পড়বে না; বরং 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর নামায যদি ওয়াজিব, সুন্নাত কিংবা নফল হয়, তাহলে এ দু'রাকআত প্রথম দু'রাকআতের মতই পড়তে হবে। আর নামায যদি ফরয হয়, তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে আল্হামদু শরীফের পর সূরা মেলাবে না। বাকী অন্যান্য সবকিছু প্রথম দু'রাকআতের মতই পড়বে।

প্রশ্ন ঃ সুন্নত কিংবা নফল নামায কি তিন রাকআতও পড়া যায় ?

উত্তর ঃ সুন্নত কিংবা নফল নামায তিন রাকআত হয় না। দুই কিংবা চার রাকআতই পড়তে হয়।

প্রশ্ন ঃ রুকূ করার সঠিক নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ রুকূ এমনভাবে করতে হয়, যাতে কোমর ও মাথা বরাবর থাকে। অর্থাৎ, মাথা যেন কোমর থেকে উঁচু বা নীচু না থাকে। উভয় হাত যেন

কোঁক থেকে আলাদা থাকে এবং উভয় হাত দ্বারা দু'হাঁটু শক্ত করে ধরে রাখতে হবে।

প্রশ্ন ঃ সজদা করার সঠিক নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ সজদা এমনভাবে করতে হবে, যাতে হাতের পাঞ্জা বা করতল মাটিতে থাকবে এবং কবজি ও কনুই মাটি থেকে উঁচু থাকবে। পেট রান থেকে এবং উভয় হাত কোঁক থেকে আলাদা থাকবে।

প্রশ্ন ঃ নামাযের পরে আঙ্গুলে গুণে কি পড়া হয় ?

উত্তর ঃ নামায শেষে ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ্', ৩৩ বার 'আল্‌হামদু লিল্লাহ্' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়া উচিত। তাতে অনেক বেশী সওয়াব হয়।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

তা'লীমুল ইসলাম

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পর্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তা'লীমুল ঈমান বা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস

প্রশ্ন ঃ ইসলামের ভিত্তি কয়টি বিষয়ের উপর স্থাপিত ?

উত্তর ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর স্থাপিত।

প্রশ্ন ঃ যে পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত সেগুলো কি কি ?

উত্তর ঃ সে পাঁচটি বিষয় হচ্ছে এই ঃ

প্রথম ঃ কালেমা তায়্যেবা কিংবা কালেমা শাহাদাতের মর্মকে অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করা। দ্বিতীয় ঃ নামায পড়া। তৃতীয় ঃ যাকাত দেয়া। চতুর্থ ঃ রমযান শরীফের রোযা রাখা। পঞ্চম ঃ হজ্জ করা।

প্রশ্ন ঃ কালেমা তায়্যেবা কি এবং তার অর্থ কি?

উত্তর ঃ কালেমা তায়্যেবা হল এই ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ *

আর এর অর্থ হল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল।

প্রশ্ন ঃ কালেমা শাহাদাত কি ও তার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ কালেমা শাহাদাত হল এই ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ *

আর এর অর্থ হল এই যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এ বিষয়ে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নেই এবং এ ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা ও তাঁর রাসূল।

প্রশ্ন ঃ অর্থ ও মর্ম না বুঝে শুধু মুখে কালেমা পড়ে নিলেই কি মানুষ মুসলমান হয়ে যায় ?

উত্তর ঃ না; বরং অর্থ বুঝে তা অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করা জরুরী।

প্রশ্ন ঃ অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা ও মুখে স্বীকার করাকে কি বলা হয় ?

উত্তর ঃ একে ঈমান আনা বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ মুক বা বোবা লোক মুখে স্বীকার করতে পারে না। তার ঈমান আনা কেমন করে বুঝা যাবে ?

উত্তর ঃ এমন লোকের পক্ষে প্রকৃতিগত অপারগতা থাকায় ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট বলে বুঝতে হবে। অর্থাৎ, সে ইঙ্গিতের মাধ্যমে একথা বুঝিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ এক এবং হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল।

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদেরকে কয়টি বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে ?

উত্তর ঃ সাতটি বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে, যা এই ঈমানে মুফাস্সালে উল্লিখিত রয়েছে ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ
خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ *

অর্থ ঃ আমি ঈমান এনেছি (১) আল্লাহ্ তা'আলার উপর, (২) তাঁর ফেরেশতাদের উপর, (৩) তাঁর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের উপর, (৪) তাঁর প্রেরিত পয়গম্বরগণের উপর, (৫) কিয়ামত দিবসের উপর, (৬) এ বিষয়ের উপর যে, পৃথিবীতে ভাল বা মন্দ যা কিছুই হয়, তা তক্দীর বা নিয়তির কারণেই হয় এবং (৭) এ ব্যাপারে ঈমান এনেছি যে, মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত হতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মুসলমানদের কি আকীদা-বিশ্বাস রাখা কর্তব্য ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মুসলমানদের এই আকীদা পোষণ করা কর্তব্য যে, (১) আল্লাহ্ এক, (২) আল্লাহ্ তা'আলাই এবাদত ও বন্দেগীর যোগ্য এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ বন্দেগীর যোগ্য নেই, (৩) তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই, (৪) তিনি সমস্ত বিষয় জানেন; তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই, (৫) তিনি মহা শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, (৬) তিনিই আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, তারকা-নক্ষত্র, মানুষ, ফেরেশতা, জিন এক কথায় সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সমগ্র বিশ্বের মালিক, (৭) তিনিই মৃত্যু দান করেন, তিনিই জীবন দান করেন। অর্থাৎ, সৃষ্টির জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হুকুমে হয়ে থাকে, (৮) তিনিই সমগ্র সৃষ্টিকে জীবিকা দান করেন, (৯) তিনি পানাহার ও ঘুম-নিদ্রা থেকে মুক্ত, (১০) তিনি নিজে থেকেই সর্বদা রয়েছেন এবং সর্বদা থাকবেন, (১১) তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি, (১২) না আছে তাঁর পিতা-মাতা, না আছে পুত্র-কন্যা, স্ত্রী-পরিজন; না আছে কারো সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক, তিনি এ সমস্ত সম্পর্ক থেকে পবিত্র, (১৩) পৃথিবীর সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী; তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, (১৪) তিনি তুলনাহীন, কোন কিছুই তাঁর মত নেই, (১৫) তিনি যাবতীয় ত্রুটি থেকে পবিত্র, (১৬) তিনি সৃষ্টির মত হাত, পা, নাক, কান ও আকার-অবয়ব থেকে পবিত্র। তিনি ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োগ করে দিয়েছেন, (১৭) তিনি নিজের সৃষ্টির হেদায়তের জন্য পয়গম্বর তথা নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁরা মানুষকে সত্য ধর্ম শিখান, ভাল কথা বলেন এবং মন্দ বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

মালা-ইকা বা ফেরেশতাগণ

প্রশ্ন ঃ মালা-ইকা বা ফেরেশতাগণ কারা ?

উত্তর ঃ ফেরেশতাগণ হলেন আল্লাহ্ তা'আলার এক সৃষ্টি। এরা নূরের দ্বারা সৃষ্ট। আমাদের দৃষ্টির অগোচরে। তারা পুরুষ কিংবা নারী নন। আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও পাপ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যে কাজেই নিযুক্ত করেন তারা তাতেই নিয়োজিত থাকেন।

প্রশ্ন ঃ ফেরেশতাদের সংখ্যা কত ?

উত্তর ঃ ফেরেশতাদের সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। তবে এটুকু জানা যায় যে, ফেরেশতাগণ অনেক রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে চারজন ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত ও বিখ্যাত।

প্রশ্ন ঃ নৈকট্যপ্রাপ্ত ও বিখ্যাত চারজন ফেরেশতা কারা ?

উত্তর ঃ প্রথম ঃ হযরত জিবরাঈল (আঃ), যিনি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব, হুকুম-আহকাম ও বার্তা পয়গম্বরদের কাছে নিয়ে আসতেন। দ্বিতীয় ঃ হযরত ইসরাফীল (আঃ), যিনি কিয়ামতে শিঙ্গা ফুঁকবেন। তৃতীয় ঃ হযরত মীকাঈল (আঃ), যিনি বৃষ্টির ব্যবস্থাপনা এবং মানুষের জীবিকা সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। চতুর্থ ঃ হযরত আযরাঈল (আঃ), যিনি সৃষ্টির প্রাণ সংহারের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবসমূহ

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব কয়টি ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ছোট-বড় বহু কিতাব নবী রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তবে বড়গুলোকে কিতাব আর ছোটগুলোকে সহীফা বলা হয়। কিতাবের মধ্যে চারটি বিখ্যাত।

প্রশ্ন ঃ বিখ্যাত চারটি আসমানী কিতাব কোন্ কোন্‌টি এবং কোন্ কোন্ নবীর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে ?

উত্তর ঃ (১) তাওরাত হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি, (২) যাবূর হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি, (৩) ইঞ্জীল হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি এবং (৪) কোরআন মজীদ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ সহীফা কয়টি এবং কোন্ কোন্ নবীর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে ?

উত্তর ঃ সহীফার সংখ্যা জানা নেই। তবে কিছু সহীফা হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি, কিছু হযরত শীস (আঃ)-এর প্রতি এবং কিছু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া আরও সহীফা রয়েছে সেগুলো কোন কোন নবীর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ্র রাসূল তথা পয়গম্বর (আঃ)

প্রশ্ন ঃ রাসূল কে?

উত্তর ঃ রাসূল আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা ও মানুষ হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে নিজের বান্দাদের নিকট হুকুম-আহকাম পৌঁছে দেয়ার জন্য নিযুক্ত করেন। তাঁরা সত্যবাদী হয়ে থাকেন; কখনও মিথ্যা বলেন না, কখনও কোন গোনাহ্র কাজ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেন; তাতে কম-বেশীও করেন না এবং কোন পয়গাম গোপনও করেন না।

প্রশ্ন ঃ নবী অর্থ কি ?

উত্তর ঃ নবী অর্থও তা-ই যে, তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা ও মানুষ হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেন। তাঁরা সত্যবাদী হয়ে থাকেন, কখনও মিথ্যা বলেন না, কোন পাপ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহ্কামে কোন কম-বেশী করেন না এবং কোন নির্দেশ গোপন রাখেন না।

প্রশ্ন ঃ নবী ও রাসূলের মাঝে কোন পার্থক্য আছে, নাকি উভয়ের অর্থই এক ?

উত্তর ঃ নবী ও রাসূলের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তা হল এই যে, রাসূল বলা হয় এমন পয়গম্বর বা প্রেরিত পুরুষকে, যাঁকে নতুন শরীঅত ও কিতাব দেয়া হয়েছে। আর সমস্ত পয়গম্বরকেই নবী বলা হয়, তাঁকে নতুন শরীঅত ও কিতাব দেয়া হোক বা না-ই হোক। বরং নবীগণ তাঁদের পূর্ববর্তী রাসূলের শরীঅত ও কিতাবেরই অধীন।

প্রশ্ন ঃ কোন লোক কি নিজের চেষ্টা-সাধনা ও এবাদত-বন্দেগীর দ্বারা নবী হতে পারে ?

উত্তর ঃ না, পারে না; বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাঁকে নবী মনোনীত করেন, তিনিই নবী হন। অর্থাৎ, নবী ও রাসূল হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা কিংবা চেষ্টা-সাধনার কোনই হাত নেই। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই শুধু এ মর্যাদা দান করা হয়।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ও নবী কতজন হয়েছেন ?

উত্তর ঃ পৃথিবীতে বহু নবী ও রাসূল আগমন করেছেন; কিন্তু তাঁদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। আমাদেরকে ও তোমাদেরকে এভাবেই ঈমান আনতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন আমরা তাঁদের সবাইকেই সত্য ও রাসূল বলে স্বীকার করি।

প্রশ্ন ঃ সর্বপ্রথম নবী কে ছিলেন ?

উত্তর ঃ সর্বপ্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম (আঃ)।

প্রশ্ন ঃ সর্বশেষ নবী কে ?

উত্তর ঃ সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

প্রশ্ন ঃ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোন নবী আসবেন কিনা?

উত্তর ঃ না। কারণ, নবুওত ও পয়গম্বরী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত নতুন কোন নবী আসবেন না। তাঁরপর যে ব্যক্তি নবুওতের দাবী করবে, সে মিথ্যাবাদী।

প্রশ্ন ঃ রাসূলগণের মধ্যে সর্বোত্তম রাসূল কে?

উত্তর ঃ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবী ও রাসূলগণের মধ্যে উত্তম ও মহান। তিনিও আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা ও অনুগত। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার পরে তাঁর মর্যাদাই সর্বাপেক্ষা বেশী।

কিয়ামতের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কোন্ দিনকে কিয়ামতের দিন বলা হয় ?

উত্তর ঃ কিয়ামতের দিন সে দিনকে বলা হয়, যে দিন সমস্ত মানুষ ও জীব-জন্তু মরে যাবে এবং সারা দুনিয়া বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পাহাড়গুলো ধুনা তুলোর মত উড়তে থাকবে, তারকাসমূহ ভেঙ্গে পড়বে—এক কথায় যাবতীয় বস্তু-সামগ্রী ভেঙ্গে-চুরে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ সকল প্রাণী ও মানুষ কেমন করে ধ্বংস হবে ?

উত্তর ঃ হযরত ইসরাফীল (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁ দিলে তার শব্দ এতই বিকট ও কঠোর হবে যে, তার চোটে সবাই মৃত্যুবরণ করবে এবং প্রতিটি বস্তু ভেঙ্গে-চুরে ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ কিয়ামত কবে আসবে ?

উত্তর ঃ কিয়ামত আসন্ন। কিন্তু তার সঠিক সময় আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, সে দিনটি হবে মহররম মাসের ১০ তারিখ শুক্রবার। আমাদের নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের কিছু লক্ষণ বাতলে দিয়েছেন। সেসব লক্ষণ দেখে কিয়ামতের নিকটবর্তিতা বুঝা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ কিয়ামতের লক্ষণগুলো কি কি ?

উত্তর ঃ মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীতে যখন গোনাহ্ বেশী হতে থাকবে, মানুষ নিজ পিতা-মাতার অবাধ্য হবে, তাঁদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করবে, আমানতে খেয়ানত হতে থাকবে, গান-বাধ্য ও নাচ-তামাশা ব্যাপক আকার ধারণ করবে, পরবর্তীরা পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিবর্গকে মন্দ বলতে থাকবে, মূর্খ অজ্ঞান লোকেরা নেতা হয়ে বসবে, রাখাল প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বিশাল বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করবে, অযোগ্য লোকেরা বিরাট বিরাট পদ পাবে, তখনই মনে করবে, কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে এসেছে।

তক্দীরের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ তক্দীর কাকে বলে ?

উত্তর ঃ প্রত্যেকটি বিষয় ও ভাল-মন্দ জিনিসের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে একটি আন্দাজ নির্ধারিত রয়েছে। আর প্রত্যেকটি বস্তুর সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা সেটি জানেন। আল্লাহ্ তা'আলার এই জানা ও আন্দাজকেই তক্দীর বলা হয়। কোন ভাল বা মন্দ বিষয়ই আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও আন্দাজের বাইরে নেই।

মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া

প্রশ্ন ঃ মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ কিয়ামতের দিন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর হযরত ইসরাফীল (আঃ) দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন। তখন সবকিছু পুনরায় অস্তিত্ব লাভ করবে; মানুষ জীবিত হয়ে যাবে। হাশরের মাঠে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হতে হবে। হিসাব নেয়া হবে এবং ভালমন্দ কর্মের বদলা দেয়া হবে। যে দিন এ কাজটি অনুষ্ঠিত হবে, সি দিনকেই

يَوْمُ الدِّيْنِ ও يَوْمُ الْجَزَاءِ, (সমবেত করার দিন) يَـــوْمُ الْحَـشْرِ (অর্থাৎ, বদলা দেয়ার দিন) এবং يَوْمُ الْحِسَابِ (হিসাবের দিন) বলা হয়।

প্রশ্ন : ঈমানে মুফাস্সালে যে সাতটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে কেউ যদি দু'একটি না মানে, তাহলে সে কি মুসলমান হতে পারে ?

উত্তর : কক্ষনো নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ, নবীগণের নবুওত, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবসমূহ, আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশতাগণ, কিয়ামত দিবস, তক্দীর এবং মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে বিশ্বাস না করবে, কক্ষনো মুসলমান হতে পারে না।

প্রশ্ন : মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি বলেছেন, সেগুলোর মধ্যে ফেরেশতাগণ, আল্লাহ্র কিতাবসমূহ, কিয়ামত ও তক্দীর প্রভৃতির কোন উল্লেখ নেই কেন ?

উত্তর : সে পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ রয়েছে। আর যখন কোন লোক হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনল; তখন তার জন্য মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা মান্য করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার যে কিতাব মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এনেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ল। কারণ, ঈমানে মুফাসসালে উল্লিখিত বিষয়গুলো আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব কোরআন মজীদ এবং মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকে প্রমাণিত।

প্রশ্ন : এসব বিষয় অন্তরে বিশ্বাস এবং মুখে স্বীকার করার পর নামায না পড়লে, যাকাত আদায় না করলে, রোযা না রাখলে কিংবা হজ্জ পালন না করলে সে মুসলমান থাকবে কিনা ?

উত্তর : হাঁ, মুসলমান অবশ্য থাকবে; কিন্তু কঠিন গোনাহ্গার এবং আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমান হবে। এমন লোককে 'ফাসেক' বলা হয়। এ ধরনের লোক—কৃত পাপ ও নাফরমানীর শাস্তি ভোগ করার পর অব্যাহতি পাবে।

দ্বিতীয় পর্ব

তা'লীমুল আরকান বা ইসলামী কর্ম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ط

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আমল বা কর্ম বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ যে পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত সেগুলোর প্রথমটিকে ঈমান বলা হয়। তার বিবরণ এ বইয়ের প্রথম পর্বে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস নামে তোমরা পড়েছ। এখন থাকল চারটি বিষয়, অর্থাৎ, নামায, যাকাত রমযানের রোযা ও বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ। এগুলোকেই ইসলামী আমল বা কর্ম বলা হয়। দ্বিতীয় এ পর্বে নামাযের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

নামায

প্রশ্ন ঃ নামায কাকে বলে ?

উত্তর ঃ নামায হল আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত ও উপাসনা করার একটি বিশেষ পদ্ধতি, যা স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বান্দাদেরকে শিখিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ নামায পড়ার পূর্বে কোন্ কোন্ বিষয় অপরিহার্য ?

উত্তর ঃ নামায পড়ার পূর্বে সাতটি বিষয় অপরিহার্য, যার অবর্তমানে নামায হয় না। এ সব বিষয়কে নামাযের শর্ত ও ফরয বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ নামাযের পূর্বে করণীয় অপরিহার্য সে সাতটি বিষয় কি কি ?

উত্তর ঃ (এক) শরীর পাক হওয়া, (দুই) কাপড় পাক হওয়া, (তিন) জায়গা পাক হওয়া, (চার) সতর ঢাকা, (পাঁচ) নামাযের সময় হওয়া, (ছয়) কেবলার দিকে মুখ করা এবং (সাত) নিয়ত করা।

নামাযের প্রথম শর্তের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ শরীর পাক হওয়ার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ শরীর বা দেহ পাক হওয়ার অর্থ হল, তাতে কোন রকম ময়লা বা অপবিত্রতা না থাকা।

প্রশ্ন ঃ ময়লা বা অপবিত্রতা কত প্রকার ?

উত্তর ঃ ময়লা বা নাপাকী দু'প্রকার। (এক) হাকীকী বা বস্তুগত এবং (দুই) হুকমী বা নির্দেশগত।

প্রশ্ন ঃ হাকীকী বা বস্তুগত অপবিত্রতা কাকে বলে ?

উত্তর ঃ সেসব প্রকাশ্য নাপাকী যা দেখা যায়, সেগুলোকে হাকীকী বা বস্তুগত নাপাকী বলা হয়। যেমন, পেশাব, পায়খানা, রক্ত, মদ প্রভৃতি।

প্রশ্ন ঃ হুকমী বা নির্দেশগত অপবিত্রতা কাকে বলে ?

উত্তর ঃ সেসব নাপাকী যা শরীঅতের হুকুম বা নির্দেশের দরুন প্রতীয়মান হয়; কিন্তু দেখা যায় না, সেগুলোকে হুকমী বা নির্দেশগত নাপাকী বলা হয়। যেমন, বে-ওযূ হওয়া, গোসলের প্রয়োজন হওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ নামাযের জন্য কোন্ অপবিত্রতা থেকে শরীর পাক হওয়া শর্ত ?

উত্তর ঃ উভয় প্রকার অপবিত্রতা থেকেই শরীর পাক হওয়া অপরিহার্য।

প্রশ্ন ঃ হুকমী বা নির্দেশগত অপবিত্রতা কত প্রকার ?

উত্তর ঃ দু'প্রকার। (এক) ছোট ধরনের হুকমী অপবিত্রতা, যাকে হদসে আস্গরও বলা হয় এবং (দুই) বড় ধরনের হুকমী অপবিত্রতা, যাকে হদসে আকবার কিংবা জানাবত বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ ছোট হুকমী অপবিত্রতা থেকে শরীর পাক করার উপায় কি ?

উত্তর ঃ ওযূ করে নিলেই ছোট হুকমী অপবিত্রতা থেকে শরীর পাক হয়ে যায়।

ওযূর বিবরণ

প্রশ্ন ঃ ওযূ কাকে বলে ?

উত্তর ঃ ওযূ তাকে বলা হয় যে, মানুষ যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করে, তখন পরিষ্কার পাত্রে পাক পানি নিয়ে প্রথমে কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত ধোবে, তারপর তিনবার কুল্লি করবে, মেসওয়াক করবে ও তিনবার মুখ ধোবে, অনন্তর তিনবার করে কনুই সমেত উভয় হাত ধোবে, অতঃপর একবার মাথা ও কান মসেহ করবে এবং সবশেষে উভয় পা তিনবার করে ধোবে। [ওযূর নিয়ম তা'লীমুল ইসলাম প্রথম খণ্ডে তোমরা পড়েছ।]

প্রশ্ন ঃ উপরে যে বিষয়গুলো বলা হল সেগুলো সবই কি ওযূর জন্য জরুরী ?

উত্তর ঃ ওযূতে কোন কোন বিষয় অতি জরুরী, যেগুলো ছুটে গেলে ওযূ হবে না। সেগুলোকে ওযূর ফরয বলা হয়। আবার কিছু কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যা ছুটে গেলে ওযূ হয়ে যাবে; কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ হবে। এগুলোকে সুন্নত বলা হয়। আর কিছু বিষয় এমন আছে, যেগুলো পালন করলে অনেক সওয়াব হয়; কিন্তু ছুটে গেলে কোন ক্ষতি হয় না। সেগুলোকে মুস্তাহাব বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ ওযূতে ফরয কয়টি ?

উত্তর ঃ ওযূর ফরয চারটি। (১) কপালের চুল থেকে থুতনির নীচ পর্যন্ত এবং এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত মুখ ধোয়া, (২) উভয় হাত কনুইসহ ধোয়া, (৩) মাথার চারভাগের একভাগ মসেহ করা এবং (৪) গিরাসহ উভয় পা ধোয়া।

প্রশ্ন ঃ ওযূতে সুন্নত কয়টি ?

উত্তর ঃ ওযূর সুন্নত তেরটি। (১) নিয়ত করা, (২) বিস্মিল্লাহ পড়া, (৩) প্রথমে তিনবার উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া, (৪) মেসওয়াক করা, (৫) তিনবার কুল্লি করা, (৬) তিনবার নাকে পানি দেয়া, (৭) দাড়ি খেলাল করা, (৮) হাত ও পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা, (৯) পত্যেকটি অঙ্গ তিন তিনবার করে ধোয়া, (১০) একবার পুরো মাথা মসেহ করা অর্থাৎ, ভেজা হাত ফেরানো, (১১) উভয় কান মসেহ করা, (১২) ধারাবাহিকভাবে ওযূ করা এবং (১৩) পরপর ওযূ করা অর্থাৎ, একটি অঙ্গ শুকোবার পূর্বেই অন্য অঙ্গটি ধুয়ে নেয়া।

প্রশ্ন ঃ ওযূর মুস্তাহাব কয়টি ?

উত্তর ঃ ওযূতে পাঁচটি বিষয় মুস্তাহাব। (১) ডান দিক থেকে শুরু করা, কোন কোন আলেম এটিকে সুন্নত বলেছেন এবং এটাই বলিষ্ঠ মত, (২) ঘাড় মসেহ করা, (৩) ওযূর কাজ-গুলো নিজে সম্পাদন করা অর্থাৎ, অন্য কারো সাহায্য না নেয়া, (৪) কেবলামুখী হয়ে বসা এবং (৫) পাক ও উঁচু জায়গায় বসে ওযূ করা।

প্রশ্ন ঃ ওযূতে মাকরূহ কি কি ?

উত্তর ঃ ওযূতে চারটি বিষয় মাকরূহ। (১) নাপাক জায়গায় ওযূ করা, (২) ডান হাতে নাক পরিষ্কার করা, (৩) ওযূ করার সময় পার্থিব কথাবার্তা বলা এবং (৪) সুন্নতের খেলাফ ওযূ করা।

প্রশ্ন ঃ কয়টি কারণে ওযূ ভেঙ্গে যায় ?

উত্তর ঃ আটটি কারণে ওযূ ভেঙ্গে যায়। (১) পায়খানা পেশাব করা কিংবা পায়খানা পেশাবের রাস্তা দিয়ে অন্য কোন কিছু বের হওয়া, (২) বাতকর্ম অর্থাৎ, পেছনের পথে বায়ু নির্গত হওয়া, (৩) দেহের যে কোন জায়গা থেকে রক্ত কিংবা পুঁজ বের হয়ে প্রবাহিত হওয়া, (৪) মুখ ভরে বমি করা, (৫) শুয়ে কিংবা কোন কিছুতে হেলান দিয়ে ঘুমানো, (৬) রোগ কিংবা অন্য কোন কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়া, (৭) পাগল হয়ে যাওয়া এবং (৮) নামাযের ভেতরে সশব্দে হাসা।

গোসলের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ বড় ধরনের হুকমী নাপাকী অর্থাৎ, হদসে আকবার ও জানাবত থেকে শরীরকে পবিত্র করার নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ হদসে আকবার বা জানাবতের ক্ষেত্রে গোসল করলেই শরীর পাক হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ গোসল কাকে বলে ?

উত্তর ঃ গোসল অর্থ নাওয়া। কিন্তু শরীঅতে নাওয়ার একটা বিশেষ নিয়ম রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ গোসলের সে বিশেষ নিয়মটি কি ?

উত্তর ঃ গোসলের নিয়ম হল এই যে, প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোবে, শৌচকর্ম সেরে নেবে, শরীর থেকে স্থুল বা বস্তুগত নাপাকী বা ময়লা

ধুয়ে ফেলবে, ওযূ করবে, সামান্য পানি ঢেলে শরীর হাতে ঘষে-মেজে সারা শরীরে তিনবার পানি ঢেলে দেবে। কুল্লি করবে এবং নাকে পানি দেবে।

প্রশ্ন ঃ গোসলের ফরয কয়টি ?

উত্তর ঃ গোসলের ফরয তিনটি। (১) কুল্লি করা, (২) নাকে পানি দেয়া এবং (৩) সারা শরীরে পানি বইয়ে দেয়া।

প্রশ্ন ঃ গোসলের সুন্নত কয়টি ?

উত্তর ঃ গোসলের সুন্নত পাঁচটি। (১) উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া, (২) শৌচকর্ম সম্পাদন করা এবং শরীরের কোথাও নাপাকী লেগে থাকলে তা ধুয়ে ফেলা (৩) অপবিত্রতা অপসারণের নিয়ত করা, (৪) গোসলের পূর্বে ওযূ করা এবং (৫) সারা শরীরে তিনবার পানি বইয়ে দেয়া।

মোজার উপর মাসেহ্ করা

প্রশ্ন ঃ কোন্ ধরনের মোজার উপর মাসেহ্ করা জায়েয ?

উত্তর ঃ তিন ধরনের মোজার উপর মাসেহ্ করা জায়েয।

(এক) চামড়ার মোজা যাতে পায়ের গিরা পর্যন্ত ঢেকে থাকে।

(দুই) এমন পশমী সূতী মোজা যার তলায় চামড়া লাগানো থাকে।

(তিন) এমন ধরনের পশমী সূতী মোজা, যা এতই মোটা ও পুরু হবে যে, তা পরে তিন চার মাইল পথ চললেও ফেটে যায় না।

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর কখন মাসেহ্ করা জায়েয ?

উত্তর ঃ যখন পা ধুয়ে কিংবা ওযূ করে মোজা পরে থাকবে, পরে মোজা পরা অবস্থায় ওযূ ভেঙ্গে গেলে।

প্রশ্ন ঃ একবার পরিহিত মোজার উপর কতদিন পর্যন্ত মাসেহ্ করা যায় ?

উত্তর ঃ কেউ যদি নিজের বাড়িতে কিংবা বসবাসের জায়গায় থাকে, তাহলে এক দিন এক রাত মোজার উপর মাসেহ্ করতে পারবে। আর মুসাফির হলে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসেহ্ করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর কেমন করে মাসেহ্ করতে হয় ?

উত্তর ঃ মোজার উপরিভাগে মাসেহ্ করা উচিত। তলা কিংবা গোড়ালির দিকে মাসেহ্ করলে মাসেহ্ হবে না।

প্রশ্ন ঃ ওযূ ও গোসল উভয় ক্ষেত্রে মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয কিনা ?

উত্তর ঃ ওযূর ক্ষেত্রে মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয, গোসলের ক্ষেত্রে নয়।

প্রশ্ন ঃ মাসেহ কেমন করে করবে ?

উত্তর ঃ হাতের আঙ্গুলগুলো পানিতে ভিজিয়ে তিনটি আঙ্গুল পায়ের নীচের দিকে (পায়ের আঙ্গুলের দিকে) রেখে উপরের দিকে টেনে আনতে হবে। পুরো আঙ্গুল রাখতে হবে; শুধু আঙ্গুলের মাথা রাখলে চলবে না।

প্রশ্ন ঃ ছেঁড়া মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয কিনা ?

উত্তর ঃ মোজা যদি এতটা ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, যাতে পায়ের ছোট তিনটি আঙ্গুল পরিমাণ পা খুলে থাকে কিংবা চলতে গিয়ে খুলে যায়, তাহলে তার উপর মাসেহ জায়েয নয়। আর যদি তার চেয়ে কম হয়, তবে জায়েয।

চটার উপর মাসেহ করার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ চটা কাকে বলে ?

উত্তর ঃ চটা হল সেই কাঠ কিংবা বাঁশের ফালি, যা ভাঙ্গা হাড় জোড়ানোর জন্য বাঁধা হয়। কিন্তু এখানে চটা বলতে কাঠ-বাঁশের সে ফালি কিংবা জখমের পট্টি, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি সবকিছুই উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ঃ এই চটা, পট্টি, ব্যাণ্ডেজ বা প্লাষ্টার প্রভৃতির উপর মাসেহ করার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ যদি সে চটা কিংবা পট্টি, ব্যাণ্ডেজ খোলা ক্ষতিকর হয় কিংবা অত্যন্ত কষ্টকর হয়, তবে সে চটা, পট্টি বা ব্যাণ্ডেজের উপর মাসেহ করে নেয়া জায়েয।

প্রশ্ন ঃ কতটা পট্টির উপর মাসেহ করবে ?

উত্তর ঃ পুরো পট্টির উপরই মাসেহ করা কর্তব্য তা তার নীচে যখম থাক বা না থাক।

প্রশ্ন ঃ পট্টি খুললে ক্ষতি কিংবা কষ্ট না হলে তখন হুকুম কি ?

উত্তর ঃ যদি যখম পানিতে ধোয়া ক্ষতিকর না হয়, তাহলে ধুয়ে নেয়াই জরুরী। আর যদি ধুলে ক্ষতি হয়, মাসেহতে ক্ষতি না হয়, তবে যখমের উপর মাসেহ করে নেয়া ওয়াজিব। কিন্তু যখমের উপর মাসেহ করাও যদি ক্ষতিকর হয়, তখন পট্টি বা ব্যাণ্ডেজের উপর মাসেহ করা জায়েয।

বস্তুগত বা স্থূল নাপাকীর বিবরণ

প্রশ্ন ঃ বস্তুগত নাপাকী কত প্রকার ?

উত্তর ঃ বস্তুগত নাপাকী দু'রকম। একটি 'নাজাসাতে গলীযাহ্' বা গাঢ় নাপাকী এবং অপরটি 'নাজাসাতে খফীফাহ্' বা হাল্কা নাপাকী।

প্রশ্ন ঃ গাঢ় নাপাকী ও হাল্কা নাপাকী কাকে বলে ?

উত্তর ঃ যে নাপাকী শক্ত, তাকেই গাঢ় নাপাকী বলা হয়, আর যা পাতলা, তা-ই হাল্কা নাপাকী।

প্রশ্ন ঃ কত রকম বস্তু গাঢ় নাপাকী বা নাজাসাতে গলীযাহ ?

উত্তর ঃ মানুষের পেশাব-পায়খানা, জীবজন্তুর মল-বিষ্ঠা, হারাম জীবজন্তুর পেশাব, মানুষ কিংবা জীবজন্তুর প্রবাহিত রক্ত, শরাব বা মদ, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা প্রভৃতি নাজাসাতে গলীযাহ্ বা গাঢ় নাপাকী।

প্রশ্ন ঃ নাজাসাতে খফীফাহ্ বা হাল্কা নাপাকী কি কি ?

উত্তর ঃ হালাল জীবজন্তুর পেশাব, হারাম পাখীসমূহের বিষ্ঠা নাজাসাতে খফীফাহ্।

প্রশ্ন ঃ নাজাসাতে গলীযাহ্ কি পরিমাণ ক্ষমাযোগ্য ?

উত্তর ঃ নাজাসাতে গলীযাহ্ যদি শক্তদেহী হয় যেমন, পায়খানা, তাহলে সাড়ে তিন মাষা (এক তোলার ১/৪-এর একটু বেশী) পরিমাণ ক্ষমাযোগ্য। আর যদি তা তরল হয় যেমন, পেশাব, মদ প্রভৃতি, তাহলে তা ব্রিটিশ আমলের এক টাকার আয়তন পরিমাণ ক্ষমাযোগ্য। ক্ষমাযোগ্য অর্থ হল এই যে, এতটুকু পরিমাণ নাপাকী যদি শরীরে কিংবা কাপড়ে লেগে থাকা অবস্থায় নামায পড়ে নেয়া হয়, তবে নামায হয়ে যাবে। তবে তা-ও মাকরূহ হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে এ পরিমাণ নাপাকীও লাগিয়ে রাখা জায়েয নয়।

প্রশ্ন ঃ নাজাসাতে খফীফাহ্ বা হাল্কা নাপাকী কতটুকু ক্ষমাযোগ্য ?

উত্তর ঃ কাপড় বা দেহের কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশ থেকে কম হলে তা ক্ষমাযোগ্য।

প্রশ্ন ঃ নাজাসাতে হাকীকিয়াহ্ বা বস্তুগত নাপাকী থেকে কাপড় কিংবা শরীরকে কিভাবে পাক করা যায় ?

উত্তর ঃ নাজাসাতে হাকীকিয়াহ্ গাঢ় হোক বা হাল্কা, কাপড়ে হোক বা শরীরে

পানি দ্বারা তিনবার ধুয়ে নিলেই পাক হয়ে যায়। কাপড় হলে তিনবার নিংড়ানোও জরুরী।

প্রশ্ন ঃ পানি ছাড়া অন্য কোন জিনিসের দ্বারা পাক হতে পারে কিনা ?

উত্তর ঃ হাঁ হতে পারে; সির্কা বা তরমুজের পানির মত তরল প্রবহমান পদার্থের দ্বারা ধুলেও নাজাসাতে হাকীকিয়াহ্ পাক হয়ে যায়।

এস্তেন্‌জা বা শুচিতার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ এস্তেন্‌জা বা শুচিতা কাকে বলে ?

উত্তর ঃ পেশাব-পায়খানা করার পর যে নাপাকী শরীরে লেগে থাকে, তা পাক বা পরিষ্কার করাকে এস্তেন্‌জা বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ পেশাবের পর এস্তেন্‌জার নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ পেশাব করার পর মাটির পাক ঢেলার দ্বারা পেশাব শুকিয়ে নেয়ার পর পানি দ্বারা ধুয়ে নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ পায়খানা করার পর এস্তেন্‌জার নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ পায়খানা করার পর তিন বা পাঁচটি মাটির ঢেলার দ্বারা গুহ্যদ্বার পরিষ্কার করার পর পানির দ্বারা ধুয়ে নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ এস্তেন্‌জা করা কি ?

উত্তর ঃ পেশাব-পায়খানা যদি নিজের জায়গা ছেড়ে এদিক ওদিক না লাগে, তাহলে এস্তেন্‌জা করা মুস্তাহাব। নাপাকী যদি এদিকে ওদিকে লেগে যায়, তখন তা যদি এক সিকি পরিমাণ বা তদপেক্ষা কম হয়, তাহলে এস্তেন্‌জা করা সুন্নত। আর যদি তা এক সিকি অপেক্ষা বেশী লেগে থাকে, তাহলে এস্তেন্‌জা করা ফরয।

প্রশ্ন ঃ কি ধরনের বস্তুর দ্বারা এস্তেন্‌জা করা উচিত ?

উত্তর ঃ মাটির পাক ঢেলা কিংবা পাথর দ্বারা।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ বস্তুর দ্বারা এস্তেন্‌জা করা মাকরূহ ?

উত্তর ঃ হাড়, গোবর, খাদ্যবস্তু, কয়লা, অঙ্গার, কাপড় ও কাগজ দ্বারা এস্তেন্‌জা করা মাকরূহ।

প্রশ্ন ঃ কোন্ হাতে এস্তেন্‌জা করা উচিত ?

উত্তর ঃ বাঁ হাতে করা উচিত; ডান হাতে এস্তেন্‌জা করা মাকরূহ।

পানির বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ পানি দ্বারা ওযূ করা জায়েয ?

উত্তর ঃ বৃষ্টির পানি, ঝর্ণা বা কুয়ার পানি, নদী বা সাগরের পানি, বরফ বা শিলার পানি, বড় পুকুর বা বড় হাউজের পানি—এসব পানি দ্বারা ওযূ ও গোসল করা জায়েয।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ পানির দ্বারা ওযূ করা জায়েয নয় ?

উত্তর ঃ ফল কিংবা বৃক্ষ নিংড়ানো পানি, ঝোল এবং সেসব পানি যার রং, গন্ধ ও স্বাদ কোন পাক বস্তুর মিশ্রণের দরুন পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং পানি গাঢ় হয়ে যায়। এমন অল্প পানি যাতে কোন নাপাক বস্তু পড়ে যায় কিংবা কোন জীব-জন্তু পড়ে মরে যায়, এমন পানি যার দ্বারা ওযূ কিংবা গোসল করা হয়েছে, এমন পানি যাতে নাপাকীর প্রভাব বেশী, হারাম জীবজন্তুর উচ্ছিষ্ট পানি, মৌরি, গোলাপ কিংবা অন্য কোন ওষুধ বা ভেষজ নিংড়ানো নির্যাস।

প্রশ্ন ঃ যে পানির দ্বারা ওযূ বা গোসল করা হয়েছে, তাকে কি বলা হয় ?

উত্তর ঃ এমন পানিকে মুস্তা'মাল (ব্যবহৃত) পানি বলা হয়, যা নিজে পাক কিন্তু তাতে ওযূ বা গোসল করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ জীবজন্তুর উচ্ছিষ্ট পানি নাপাক ?

উত্তর ঃ কুকুর, শূকর এবং যে কোন হিংস্র শিকারী জীবজন্তুর উচ্ছিষ্ট পানি নাপাক। তেমনিভাবে বিড়াল, ইঁদুর কিংবা অন্য কোন পশু খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে যে পানি পান করে, তাহার উচ্ছিষ্ট সে পানি নাপাক। যে ব্যক্তি মদ পান করে সাথে সাথে পানি পান করল, তার উচ্ছিষ্ট পানিও নাপাক।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ জীবজন্তুর উচ্ছিষ্ট পানি মাকরূহ ?

উত্তর ঃ বিড়াল (তৎক্ষণাৎ ইঁদুর খেয়ে না থাকলে), টিকটিকি, খোলা মুরগী, মলখেকো গরু, মোষ, কাক, চিল, বাজ ও এ ধরনের সমস্ত জীবের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ জীবের উচ্ছিষ্ট পানি পাক ?

উত্তর ঃ মানুষ ও যাবতীয় হালাল পশুর উচ্ছিষ্ট পানি পাক যেমন, গরু, ছাগল, ঘুঘু, কবুতর, ঘোড়া প্রভৃতি।

প্রশ্ন ঃ কোন্ পানি নাপাকী পড়লে অপবিত্র হয়ে যায় ?

উত্তর ঃ দু'রকম পানি ছাড়া সব পানিই নাপাকী পড়লে নাপাক বা অপবিত্র হয়ে যায় ঃ (১) নদী বা সাগরের প্রবহমান পানি এবং (২) বহমান নয় এমন আবদ্ধ বেশী পানি যেমন বড় পুকুর বা বড় হাউজের পানি।

প্রশ্ন ঃ বদ্ধ বেশী পানির পরিমাণ কি ?

উত্তর ঃ যে বদ্ধ পানি মাপা গজে সাড়ে পাঁচ গজ লম্বা ও সাড়ে পাঁচ গজ প্রস্থ তা বেশী পানি। আর যে হাউজ বা পুকুর এ পরিমাণ বড়, সেগুলো বড় হাউজ বা বড় পুকুর হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন ঃ নাপাকী পড়া ছাড়া আর কিসের দরুন সামান্য বা অল্প পানি নাপাক হয়ে যায় ?

উত্তর ঃ যদি পানিতে এমন কোন জীব পড়ে মরে যায়, যাতে প্রবাহিত রক্ত থাকে, তাহলে পানি নাপাক হয়ে যায় যেমন, পাখি, মুরগী, কবুতর, বিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতি।

প্রশ্ন ঃ বড় পুকুর বা হাউজের পানি কখন নাপাক হয় ?

উত্তর ঃ যখন তাতে নাপাকীর স্বাদ, রং বা গন্ধ প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ জীব পানিতে মরলে পানি নাপাক হয় না ?

উত্তর ঃ যেসব জীব পানিতে জন্মে থাকে যেমন, মাছ, বেঙ এবং সেসব জীব যাতে প্রবাহিত রক্ত নেই যেমন, মশা, মাছি, টিকটিকি, পিঁপড়ে প্রভৃতি পানিতে মরলে তা নাপাক হয় না।

কুয়ার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা কুয়া নাপাক হয়ে যায় ?

উত্তর ঃ যদি গাঢ় অথবা হাল্কা নাপাকী কুয়াতে পড়ে কিংবা প্রবাহিত রক্তবাহী কোন জীব কুয়ায় পড়ে মরে যায়, তাহলে কুয়া নাপাক হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ কুয়ায় যদি কোন পশু পড়ে জীবিত বেরিয়ে আসে, তবে কুয়া পাক থাকবে, নাকি নাপাক হয়ে যাবে ?

উত্তর ঃ যদি এমন কোন পশু পড়ে, যার উচ্ছিষ্ট নাপাক কিংবা এমন কোন পশু পড়ে, যার গায়ে নাপাকী লেগে ছিল তাহলে কুয়া নাপাক হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে সেসব হালাল বা হারাম পশু যার উচ্ছিষ্ট নাপাক নয় এবং সেগুলোর গায়ে নাপাকীও লেগে না থাকে এবং সেগুলো কুয়ায় পড়ে জীবিত বেরিয়ে আসে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোর পেশাব-পায়খানা করে দেয়ার স্থির বিশ্বাস না হয়ে যায়, কুয়া নাপাক হবে না।

প্রশ্ন ঃ কুয়া নাপাক হয়ে গেলে, তা পাক করার উপায় কি ?

উত্তর ঃ কুয়াকে পাক করার পাঁচটি উপায় রয়েছে ঃ

(১) কুয়ায় নাপাকী পড়ে গেলে তার সমস্ত পানি বের করে ফেললে, তা পাক হয়ে যাবে।

(২) মানুষ, শূকর, কুকুর, বক্‌রী, বিড়াল কিংবা এতাদৃশ বা এগুলোর চাইতে বড় অন্য কোন জীবজন্তু কুয়ায় পড়ে মরে গেলে সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে।

(৩) যখন প্রবাহিত রক্তওয়ালা কোন জীবজন্তু কুয়ায় পড়ে মরে গিয়ে ফুলে ফেটে যাবে, তখন সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে। তা প্রাণীটি ছোট হোক কিংবা বড় হোক।

(৪) যখন কবুতর, মুরগী, বিড়াল কিংবা এমনি আকারের কোন প্রাণী পড়ে মরে যায়; কিন্তু ফুলে না যায়, তখন চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে।

(৫) আর যদি ইঁদুর, চড়ুই কিংবা এমনই আকারের কোন প্রাণী পড়ে মরে যায়, তবে কুড়ি বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে। কুড়ির স্থলে ত্রিশ এবং চল্লিশের স্থলে ষাট বালতি তুলে ফেলা মুস্তাহাব।

প্রশ্ন ঃ মৃত কোন প্রাণী কুয়ায় পড়ে গেলে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ মৃত প্রাণীর পড়ার হুকুমও তাই, যা কুয়ায় পড়ে মরার ব্যাপারে বলা হয়েছে। যেমন, মৃত ছাগল পড়লে সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে। আর মৃত বিড়াল পড়লে চল্লিশ থেকে ষাট বালতি এবং মৃত ইঁদুর পড়লে কুড়ি থেকে ত্রিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ফুলা কিংবা গলিত প্রাণী পড়ে গেলে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে। যেমন, কুয়ায় পড়ে মরে ফুলে গলে গেলে করতে হত।

প্রশ্ন ঃ যদি কুয়ার ভেতর মৃত প্রাণী পাওয়া যায় এবং সেটি কখন পড়েছে তা জানা না থাকে, তবে এর হুকুম কি ?

উত্তর ঃ যখন সেটি পাওয়া যাবে, ঠিক তখন থেকেই কুয়াটিকে নাপাক মনে করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ বালতি বলতে কত বড় বালতি উদ্দেশ্য ?

উত্তর ঃ যে কুয়াতে যে বালতি লাগানো থাকবে সেটিই ধর্তব্য হবে।

প্রশ্ন ঃ যত বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে, তা একবারেই তুলতে হবে, না কয়েকবারে তুলে ফেললেও চলবে ?

উত্তর ঃ কয়েকবারে তোলাও জায়েয। যেমন, ষাট বালতি বের করতে হলে কুড়ি বালতি ভোরে, কুড়ি বালতি দুপুরে এবং কুড়ি বালতি বিকেলে তোলাও জায়েয।

প্রশ্ন ঃ যে বালতি ও দড়ীর দ্বারা নাপাক কুয়ার পানি তোলা হয়, সেগুলো পাক কিনা ?

উত্তর ঃ প্রয়োজনীয় পানি তুলে ফেলার পর কুয়া, বালতি, দড়ী সবই পাক হয়ে যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

তা'লীমুল ইসলাম

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পর্ব

তা'লীমুল ঈমান বা ইসলামী আক়ায়েদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ *

তওহীদ বা একত্ববাদ

প্রশ্ন ঃ তওহীদের অর্থ কি?

উত্তর ঃ অন্তর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকে এক জানা এবং মুখে তা স্বীকার করাকে তওহীদ বলে।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে এক, মানুষ তা কেমন করে বুঝতে পারল ?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ মানুষের বিবেক (যদি তা সুষ্ঠু হয়) আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব এবং তাঁর এক হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করে। আর সে কারণেই পৃথিবীতে যত বড় বড় বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ ও দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের সবাই আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ বা এক হওয়ার প্রবক্তা। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তা'আলার নবী-রাসূলগণ ঐকমত্যে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের সবাই বলেছেন, আল্লাহ্ এক এবং তাঁর মত আর কেউ নেই।

প্রশ্ন ঃ কোরআন মজীদে কি তওহীদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, কোরআনে পরিপূর্ণ ও উত্তমভাবে তওহীদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলতে গেলে বর্তমান পৃথিবীতে কোরআনই একমাত্র কিতাব যা নির্ভেজাল ও খাঁটি তওহীদের শিক্ষা দেয়। অবশ্য পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতেও তওহীদের শিক্ষা দেয়া হয়েছিল; কিন্তু সে সমস্ত কিতাবকে লোকেরা বিকৃত (রদবদল) করে ফেলেছে এবং তওহীদবিরোধী কথাবার্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে। এভাবে আল্লাহ্‌র পাঠানো আসমানী শিক্ষাকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। এরই প্রতিকারকল্পে এবং সত্যিকার তওহীদ পৃথিবীতে প্রচার করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন এবং নিজের বিশেষ কিতাব কোরআন মজীদ অবতীর্ণ করেছেন। আর এতে স্পষ্ট ভাষায় সত্য ও নির্ভেজাল তওহীদের শিক্ষা দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ কোরআনের কোন্ আয়াতগুলোর দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হয় ?

উত্তর ঃ সমগ্র কোরআন মজীদেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তওহীদের শিক্ষা বিদ্যমান। তার মধ্যে কয়েকটি আয়াত হল ঃ

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ط (سورة بقرة ركوع-١٩)

অর্থাৎ, তোমাদের উপাস্য হলেন এক আল্লাহ্ ; তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি অত্যন্ত করুণাময় দয়ালু। (সূরা বাকারা, রুকূ ১৯)

দ্বিতীয় আয়াত ঃ

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ط لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ط (سورة اٰل عمران : ركوع-٢)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই স্বাক্ষী যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ বা উপাস্য নেই এবং ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করেন। তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি পরাক্রমশীল প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান, রুকূ ২)

এমনি আরো অসংখ্য আয়াত আল্লাহ্র একত্বের শিক্ষা দান করে। যেমন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ অর্থাৎ, বলে দাও, আল্লাহ্ এক।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্র যাতী বা সত্তাগত নাম কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার যাতী নাম হল 'আল্লাহ্'। একে ইস্মে যাত বা ইসমে যাতীও বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ 'আল্লাহ্' শব্দটি ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার অন্য নামসমূহ যেমন, 'খালেক' 'রায্যাক' প্রভৃতি নামগুলোকে কি বলা হয় ?

উত্তর ঃ 'আল্লাহ্' শব্দ ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য নামকে সিফাতী বা গুণবাচক নাম বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ সিফাতী বা গুণবাচক নামের অর্থ কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার অনেকগুলো গুণ রয়েছে। যেমন, আদি হওয়া অর্থাৎ, চিরকাল থেকে থাকা এবং চিরকাল থাকা। জ্ঞানী হওয়া অর্থাৎ, সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া। সক্ষমতা অর্থাৎ, যাবতীয় বিষয়ের উপর তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা থাকা। 'হাই' অর্থাৎ, চিরকাল জীবিত থাকা প্রভৃতি। সুতরাং যেসব নাম এসব গুণের মধ্য থেকে কোন গুণ প্রকাশ করে, তাকেই সিফাতী নাম বা গুণবাচক নাম বলা হয়।

এর একটা উদাহরণ এভাবে দেয়া যেতে পারে– যেমন, একটি লোকের নাম জামীল, যা শুধু তার সত্তাগত পরিচয় বহন করে। এতে তার কোন গুণের পরিচয় নেই। কিন্তু লোকটি জ্ঞান অর্জন করেছে, লেখতেও জানে, কোরআন মজীদও মুখস্থ করে নিয়েছে। কাজেই এসব গুণের আলোকে তাকে 'জ্ঞানী'; 'আলেম', 'লেখক' এবং 'হাফেযও' বলা হয়। এক্ষেত্রে জামীল হল তার সত্তাগত নাম, আর আলেম, মুনশী ও হাফেয তার গুণগত নাম। কারণ, তাঁর শিক্ষাগুণ কিংবা লেখাগুণ অথবা কোরআন মুখস্থ করার গুণের আলোকে এসব নাম রাখা হয়েছে। এমনিভাবে 'আল্লাহ্' শব্দটি হল আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাগত নাম কিংবা 'ইস্মে যাত'। আর 'খালেক' (স্রষ্টা), 'কাদের' (শক্তিমান), 'আলেম' (সর্বজ্ঞ), 'মালেক' (সর্বাধিকারী) প্রভৃতি হল তাঁর গুণগত বা সিফাতী নাম।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার যাতী নাম তো একটি 'আল্লাহ্' শব্দ। তাঁর সিফাতী বা গুণবাচক নামের সংখ্যা কত ?

উত্তর ঃ কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا (سورة اعراف : ركوع-٢٢)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার বহুবিধ উত্তম নাম রয়েছে; তাঁকে সেসব নামে ডাক। (সূরা আ'রাফ, রুকূ ২২)

আর হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে ঃ

اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِّائَةً اِلاَّ وَاحِدًا– (بخارى)

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বই অর্থাৎ, এক কম একশ' নাম রয়েছে। (বোখারী)

মালা-ইকা (ফেরেশতাগণ)

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী ফেরেশ্তাগণকে ছাড়া অন্য সব ফেরেশ্-তার পারস্পরিক মর্যাদা কি সমান, নাকি কমবেশী রয়েছে ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী চারজন ফেরেশতা যাদের নাম তোমরা তা'লীমুল ইসলামের দ্বিতীয় খণ্ডে পড়ে এসেছ, তারা সমস্ত ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম। এদেরকে ছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাও পারস্পরিক কমবেশী মর্যাদার অধিকারী; কেউ বেশী নৈকট্যশীল কেউ কম।

প্রশ্ন ঃ ফেরেশতারা কি কাজ করেন ?

উত্তর ঃ সমস্ত আসমান ও যমীনে অসংখ্য ফেরেশতা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। ব্যাপারটা এভাবে বোঝা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। ফেরেশতারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে থাকেন।

প্রশ্ন ঃ ফেরেশতাদের কিছু কাজের কথা বল ?

উত্তর ঃ হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহ্কাম ও কিতাবসমূহ নবীগণের কাছে নিয়ে আসতেন। অনেক সময় নবীগণের সাহায্য সহায়তা এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যও পাঠানো হয়েছে। কোন কোন সময় আল্লাহ্ তা'আলা নাফরমান বান্দাদের প্রতি আযাবও তাঁর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।

হযরত মীকাঈল (আঃ) সৃষ্টিকে রুজি পৌঁছান এবং বৃষ্টি প্রভৃতির ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। আর অসংখ্য ফেরেশতা তাঁর অধীনে কাজ করে থাকেন। কেউ কেউ মেঘ-মালার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত, কেউ কেউ বায়ুর ব্যবস্থাপনায়, কেউ কেউ সাগর-সমুদ্র, নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুর-ঝিলের ব্যবস্থাপনায়

নিয়োজিত রয়েছেন। এ সব বিষয়ের ব্যবস্থাপনা তাঁরা আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী সম্পন্ন করে থাকেন।

হযরত ইসরাফীল (আঃ) কিয়ামতের প্রাক্কালে শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন। হযরত আযরাঈল (আঃ) প্রাণীদের প্রাণ সংহার করার কাজে নিয়োজিত এবং তাঁর তত্ত্বাবধানেও অসংখ্য ফেরেশতা কাজ করেন। সৎ বান্দাদের প্রাণ কব্য করার জন্য পৃথক ফেরেশতা এবং অসৎ বান্দাদের প্রাণ কব্য করার জন্য পৃথক ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়াও ফেরেশতাদের কিছু কিছু কাজ রয়েছে এরূপ ঃ

(১) প্রত্যেকটি মানুষের সাথে দু'জন করে ফেরেশতা থাকেন। একজন ফেরেশতা তার নেক কাজ তথা সৎকর্মগুলো লিখে রাখেন এবং অন্যজন লেখেন মন্দকর্মগুলো। এসব ফেরেশতাদেরকে বলা হয়, 'কিরামান কাতেবীন'।

(২) কিছু ফেরেশতা মানুষকে বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। শিশু, বুড়ো, দুর্বলদের এবং অন্যান্য যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ হুকুম করেন, তারা তাদের হেফাযত করেন।

(৩) কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন মৃত্যুর পর কবরে মানুষদেরকে প্রশ্ন করার জন্য। প্রত্যেকটি মানুষের কবরেই দু'জন করে ফেরেশতা আসেন। তাদেরকে 'মুন্কার' ও 'নাকীর' বলা হয়।

(৪) কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন বিশ্বময় ঘুরাফেরা করার জন্য, যাতে তারা দুনিয়ার যে কোনখানে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির-আযকার, ওয়ায-নসীহত হয়, কোরআন তেলাওয়াত হয়, দুরূদ শরীফ পাঠ হয়, দ্বীনী এলমের শিক্ষা দেয়া হয়, এমন সব মজলিস বা সমাবেশে উপস্থিত হন এবং যত মানুষ এসব মজলিসে, সমাবেশে এবং সেই সৎকর্মে অংশগ্রহণ করেন, তাদের উপস্থিতির সাক্ষ্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দিতে পারেন। পৃথিবীতে যেসব ফেরেশতা কাজ করেন, সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পরিবর্তনও হয়। ভোরের নামাযের সময় রাতের ফেরেশতারা আকাশে ফিরে যান এবং দিনের ফেরেশতারা চলে আসেন। আবার আসরের নামাযের পর দিনের ফেরেশতারা চলে যান এবং রাতের ফেরেশতারা চলে আসেন।

(৫) কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন বেহেশতের ব্যবস্থাপনা ও তার কাজ কর্মে।

(৬) কিছু রয়েছেন দোযখের ব্যবস্থাপনায়।

(৭) কিছু ফেরেশতা রয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলার আরশ বহন করার জন্য।

(৮) আর কিছু ফেরেশতা রয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত বন্দেগী ও তাসবীহ্ তাকদীস তথা প্রশংসা ও মহত্ত্ব বর্ণনায় মশ্গুল।

প্রশ্ন ঃ একথা কেমন করে জানা গেল যে, ফেরেশতারা এসব কাজকর্ম করেন ?

উত্তর ঃ এসব বিষয় কোরআন মজীদে ও হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবসমূহ

প্রশ্ন ঃ তওরাত, যবূর ও ইন্‌জীল যে আসমানী কিতাব তা কেমন করে জানা গেল ?

উত্তর ঃ এ তিনটি যে আসমানী কিতাব তা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। তওরাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে বলেছেন ঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ– (سورة مائدة : ركوع–٧)

অর্থাৎ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়ত ও নূর রয়েছে। (সূরা মা-ইদাহ্, রুকূ ৭)

যবূর সম্পর্কে বলেছেন ঃ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا (سوره نساء ركوع ٢٣)
অর্থাৎ, আমি দাঊদ (আঃ)-কে দান করেছি যবূর। (সূরা নিসা; রুকূ ২৩)
ইন্‌জীল সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ

وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ– (سورة حديد : ركوع–٤)

অর্থাৎ, মারইয়ামের পূত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি এবং তাকে দান করেছি ইন্‌জীল। (সূরা হাদীদ, রুকূ ৪)

কাজেই মুসলমানরা কোরআন মজীদের মাধ্যমেই উল্লেখিত তিনটি গ্রন্থের আসমানী কিতাব হওয়ার কথা জানতে পেরেছে।

প্রশ্ন ঃ কোন লোক যদি তওরাত, যবূর ও ইন্‌জীলকে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব বলে না মানে, তাহলে সে কি ?

উত্তর ঃ এমন লোক কাফের। কারণ, এসব কিতাব যে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব, তা কোরআন মজীদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব বলে মানে না, সে মূলতঃ কোরআনের কথিত বিষয়ই অমান্য করে। আর যে ব্যক্তি কোরআনের বলা বিষয় অমান্য করে, সে কাফের।

প্রশ্ন ঃ তাহলে কি খৃষ্টানদের কাছে যে তওরাত, যবূর ও ইন্‌জীল রয়েছে, তা-ই কি আসল আসমানী তওরাত, যবূর ও ইন্‌জীল ?

উত্তর ঃ না, তা না। কারণ, কোরআন মজীদের মাধ্যমে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, লোকেরা সেসব কিতাবকে রদবদল করে ফেলেছে। কাজেই বর্তমান তওরাত, যবূর ও ইন্‌জীল আসল সে আসমানী কিতাব নয়; বরং তাতে 'তাহ্‌রীফ' বা রদবদল হয়ে গেছে। তাই বর্তমান এ তিনটি কিতাব সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করা উচিত নয় যে, এগুলো আসল আসমানী কিতাব।

প্রশ্ন ঃ একথা কেমন করে জানা গেল যে, কোন কোন নবীর প্রতি 'সহীফা' অবতীর্ণ হয়েছে ?

উত্তর ঃ তাও কোরআন মজীদের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন নবীর প্রতি সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনের সূরা আ'লা তথা سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى সূরায় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব নাকি তাঁর কালাম ?

উত্তর ঃ কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবও বটে এবং তাঁর কালামও বটে। কোরআন মজীদে একে কিতাবুল্লাহ্ও বলা হয়েছে এবং কালামুল্লাহও বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ তওরাত, যবূর, ইন্‌জীল ও কোরআন মজীদের মধ্যে কোন্ কিতাবটি সর্বোত্তম ?

উত্তর ঃ কোরআন মজীদ সর্বোত্তম।

প্রশ্ন ঃ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর কোরআন মজীদের শ্রেষ্ঠত্ব কি ?

উত্তর ঃ কোরআন মজীদের বহুবিধ শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। তার কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

(১) কোরআন মজীদের প্রত্যেকটি শব্দ ও বর্ণ সংরক্ষিত, এগুলোর মধ্যে একটি বিন্দু-বিসর্গও পরিবর্তিত হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতেও পারবে না। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে মানুষেরা 'তাহ্‌রীফ' বা রদবদল করে ফেলেছে।

(২) কোরআন মজীদের এবারতগুলো এমনি উচ্চমাত্রিক যে, এর ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র সূরার অনুরূপ কোন সূরাও কেউ গঠন করতে পারবে না।

(৩) কোরআন মজীদ সর্বশেষ শরীঅত তথা ধর্মশাস্ত্রের বিধান নিয়ে এসেছে। তাই এর অনেক বিধান পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিধি-বিধানকে রহিত করে দিয়েছে।

(৪) পূর্ববর্তী কিতাবগুলো একত্রে একবার নাযিল হয়েছে আর কোরআন মজীদ নাযিল হয়েছে প্রয়োজন মোতাবেক অল্প অল্প করে দীর্ঘ তেইশ বছরে।

ক্রমে ক্রমে ও প্রয়োজন মোতাবেক অবতীর্ণ হওয়ার কারণে এটি মানুষের অন্তরে বসে যেতে থাকে এবং শত সহস্র মানুষ এর বিধান মেনে নিয়ে মুসলমান হতে থাকে।

(৫) কোরআন মজীদ লক্ষ লক্ষ মুসলমানের অন্তরে সংরক্ষিত রয়েছে এবং এটি বক্ষ থেকে বক্ষান্তরে স্বয়ং রাসূলে করীম (দঃ)-এর আমল থেকে আজও পর্যন্ত বরাবর চলে আসছে। ইন্‌শাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত এমনিভাবে চলতে থাকবে। এভাবে বক্ষ থেকে বক্ষান্তরে সংরক্ষণের কারণে ইসলামের দুশমনরা কখনও কোরআন মজীদে কোন রকম হেরফের করতে পারেনি কিংবা একে দুনিয়া থেকে মুছে দিতে সক্ষম হয়নি। (ইন্‌শাআল্লাহ্) কিয়ামত পর্যন্ত এমন সুযোগ পাবেও না।

(৬) কোরআন মজীদের হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধানগুলো এমনি ভারসাম্যপূর্ণ যে, সব যুগে সব জাতির জন্যই উপযোগী। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি-সম্প্রদায় নেই যারা কোরআন মজীদের হুকুম-আহকামের উপর আমল করতে পারে না। কোরআন মজীদের হুকুম-আহকাম যেহেতু সব যুগে সব জাতি-সম্প্রদায়ের জন্যই উপযোগী, তাই কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হওয়ার পর অন্য কোন শরীঅত ও আসমানী কিতাবের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেনি। সে কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতকে সারা দুনিয়ার জন্য ব্যাপক করে দেয়া হয়েছে।

রেসালাত

প্রশ্ন ঃ সমস্ত নবী বা পয়গম্বরের নাম তো কারোই জানা নেই, তবে কয়েকজন বিখ্যাত নবীর নাম বল ?

উত্তর ঃ বিখ্যাত কয়েকজন নবীর নাম হল এই ঃ হযরত আদম (আঃ), হযরত শীস (আঃ), হযরত ইদ্রীস (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইয়া'কূব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারূন (আঃ), হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইল্‌ইয়াস (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত লূত (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ), হযরত হূদ (আঃ), হযরত শো'আইব (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) ও খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

প্রশ্ন ঃ মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের কোন্ খান্দান বা বংশে জন্মগ্রহণ করেন ?

উত্তর ঃ হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আরবের সমস্ত বংশের মধ্যে কোরাইশ বংশের সম্মান ও মর্যাদা ছিল সর্বাধিক। কোরাইশ বংশের লোকদেরকে আরবের অন্যান্য বংশের সর্দার গণ্য করা হত।

আবার কোরাইশ বংশেরই একটি শাখা ছিল বনী হাশেম। এ শাখার মর্যাদা ছিল কোরাইশদের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা বেশী। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শাখা অর্থাৎ, বনী হাশেমেরই সন্তান ছিলেন। সে জন্যই হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাশেমীও বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ হাশেম কে ছিলেন, যার বংশধরকে বনী হাশেম বলা হয় ?

উত্তর ঃ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরদাদার নাম হাশেম। তাঁর বংশ পরম্পরা এরূপ ঃ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, ইবনে হাশেম, ইবনে আবদে মনাফ।

প্রশ্ন ঃ মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ পরম্পরায় হযরত আদম (আঃ)-এর পর অন্য কোন নবী আছেন কিনা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আছেন। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর। আর হযরত ইসমাঈল (আঃ) হলেন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ)-এর পুত্র। এ দু'জন ছাড়া হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইদ্রীস (আঃ) ও হযরত শীস (আঃ) মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত বছর বয়সে নবুওত প্রাপ্ত হয়েছিলেন ?

উত্তর ঃ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন চল্লিশ বছর, তখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয়।

প্রশ্ন ঃ ওহী বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ ওহী অর্থ হল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের হুকুম-আহ্কাম এবং নিজের কালাম বা বাণী হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল করতে শুরু করেন।

প্রশ্ন ঃ ওহী নাযিল হওয়ার পর কত বছর হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন ?

উত্তর ঃ তেইশ বছর; তের বছর মক্কা মুআয্যমায় আর দশ বছর মদীনা মুনাওয়ারায়।

প্রশ্ন ঃ মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় চলে যান কেন ?

উত্তর ঃ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা মুআয্যমার লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ বা একত্ববাদের শিক্ষা দিতে গিয়ে তাদেরকে বললেন যে, মূর্তিপূজা ছেড়ে দাও এবং এক আল্লাহ্র উপর ঈমান আন, তখন তারা তাঁর শত্রু হয়ে গেল। কেননা, তারা মূর্তিপূজা করত এবং সেগুলোকে উপাস্য মনে করত এবং নানাভাবে তারা মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিতে লাগল। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষমূলক নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করেও তওহীদের তা'লীম দিতে থাকেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহ্কাম পৌঁছাতে থাকেন। কিন্তু যখন তাদের শত্রুতার কোন সীমা রইল না এবং সবাই মিলে মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন হুযূরে আনওয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র হুকুমে নিজের প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা মুআয্যমা ছেড়ে মদীনা মুনাওয়ারা চলে যান। মদীনা মুনাওয়ারার লোকেরা আগেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং তারা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় আগমনের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। যখন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পদার্পণ করেন, তখন সেখানকার মুসলমানরা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের নিজের জান ও মালের দ্বারা সাহায্য সহায়তা দান করেন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনা চলে যাবার সংবাদ শোনার পর অন্যান্য মুসলমানরাও যাদেরকে কাফেররা নির্যাতন করত ক্রমে ক্রমে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে যান।

মহানবী হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যাওয়াকে 'হিজরত' বলা হয়। আর যেসব মুসলমান নিজের বাড়ীঘর ছেড়ে মদীনায় চলে যান, তাদেরকে বলা হয়, 'মুহাজির'। অপরদিকে মদীনার যেসব মুসলমান হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুহাজিরদের সাহায্য সহায়তা করেন, তাদেরকে বলা হয় 'আনসার'।

প্রশ্ন ঃ মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওত দাবীর পূর্বে আরবের লোকেরা তাঁকে কেমন মনে করত ?

উত্তর ঃ নবুওত দাবীর পূর্বে সমস্ত লোক তাঁকে অত্যন্ত সত্যবাদী, সৎ ও আমানতদার লোক মনে করত। মুহাম্মদ আমীন (সত্যনিষ্ঠ মুহাম্মদ) বলে ডাকত, এর অর্থ হল এই যে, তিনি তাদের কাছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যক্তি ছিলেন। সবাই তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করত।

প্রশ্ন ঃ এ কথার কি প্রমাণ রয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না ?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ, কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে খাতামুন্নাবিয়্যীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর অর্থ হল এই যে, তিনি সমস্ত নবীর শেষ নবী। দ্বিতীয়তঃ, স্বয়ং হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ অর্থাৎ, আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবী আসবেন না। তৃতীয়তঃ, কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط (سورة مائدة : ركوع-١)

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দিয়েছি। আর দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য ইসলামকে পছন্দ করেছি। (সূরা মা-ইদাহ, রুকূ ১)

এতে প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন এবং ইসলাম সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবন বিধানে পরিণত হয়েছে। কাজেই হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোন নবী আসার প্রয়োজনীয়তাই অবশিষ্ট থাকেনি।

প্রশ্ন ঃ এ কথার কি প্রমাণ আছে যে, মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্যাদার দিক দিয়ে সমস্ত নবী-রাসূল অপেক্ষা বড় ?

উত্তর ঃ মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত নবী-রাসূলগণ অপেক্ষা উত্তম, সে কথা কোরআন মজীদের অনেক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত

রয়েছে। তাছাড়া স্বয়ং হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরশাদ করেছেন ঃ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি সমস্ত আদম সন্তানের নেতা হব।

বলাবাহুল্য, আদম সন্তানের মধ্যে সমস্ত নবী-রাসূলও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবী-রাসূল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও তাঁদের নেতা।

সাহাবায়ে কেরামের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ সাহাবী কাকে বলে ?

উত্তর ঃ সাহাবী সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি ঈমানের অবস্থায় হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন কিংবা তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়েছেন এবং ঈমানের সাথে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ সাহাবীর সংখ্যা কত ?

উত্তর ঃ হাজার হাজার, যারা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে ঈমান এনেছেন এবং মুসলমান অবস্থায় তাঁদের মৃত্যুও হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ সব সাহাবীর মর্যাদাই কি সমান, নাকি কমবেশী ?

উত্তর ঃ সাহাবীগণের মর্যাদা তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কমবেশী রয়েছে কিন্তু সমস্ত সাহাবাই অন্যান্য সমস্ত উম্মত অপেক্ষা উত্তম।

প্রশ্ন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সাহাবী কে ?

উত্তর ঃ সমস্ত সাহাবীর মধ্যে চারজন সবচেয়ে উত্তম। প্রথম, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু যিনি সমগ্র উম্মত অপেক্ষা উত্তম। দ্বিতীয়, হযরত ওমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু যিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) ছাড়া সমগ্র উম্মত অপেক্ষা উত্তম। তৃতীয়, হযরত ওসমান গনী রাযিয়াল্লাহু আন্হু যিনি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর পর সমগ্র উম্মত অপেক্ষা উত্তম এবং চতুর্থ হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু যিনি হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ)-এর পর সমগ্র উম্মত অপেক্ষা উত্তম। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর এ চারজনই তাঁর খলীফা হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ খলীফা হওয়ার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া থেকে তিরোধানের পর দ্বীনের দায়িত্ব পালন এবং যেসব ব্যবস্থাপনা হুযূর চালাতেন, সেগুলো অব্যাহত রাখার জন্য যে ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, তাঁকেই খলীফা বলা হয়। খলীফা অর্থ স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সমস্ত মুসলমানের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তাই তিনি ইসলাম জগতের প্রথম খলীফা। তাঁর পরে হযরত ওমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর পরে তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হন হযরত ওসমান গনী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এবং তাঁর ওফাতের পর চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু। এ চারজনকে খোলাফায়ে আর্বা'আহ্ (খলীফা চতুষ্টয়) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন (সুপথপ্রাপ্ত খলীফা চতুষ্টয়) এবং চার ইয়ার (চার বন্ধু)ও বলা হয়।

বেলায়েত ও ওলীআল্লাহ্গণের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ ওলী কাকে বলে ?

উত্তর ঃ যে মুসলমান আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশের আনুগত্য সহকারে অধিক পরিমাণে এবাদত-উপাসনা করে, যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি সমগ্র দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় অপেক্ষা অধিক ভালবাসা পোষণ করে, সে আল্লাহ্ তা'আলর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও প্রিয় হয়ে যায়। তাঁকেই ওলী বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ ওলীর পরিচয় কি ?

উত্তর ঃ ওলীর পরিচয় হল এই যে, তিনি মুত্তাকী-পরহেযগার মুসলমান হবেন, অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত-উপাসনা করবেন, আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত তাঁর উপর সমস্ত মহব্বত অপেক্ষা প্রবল থাকবে, দুনিয়ার প্রতি তাঁর কোন লোভ থাকবে না এবং আখেরাতের প্রতি সর্বক্ষণ তাঁর খেয়াল থাকবে।

প্রশ্ন ঃ সাহাবীকে কি ওলী বলা যেতে পারে ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সমস্ত সাহাবীই আল্লাহ্র ওলী ছিলেন। কারণ, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যের কল্যাণে তাঁদের অন্তরে আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত প্রবল ছিল, দুনিয়ার প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ছিল না, অধিক পরিমাণে এবাদত করতেন, গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতেন এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশাবলীর আনুগত্য করতেন।

প্রশ্ন ঃ কোন সাহাবী কিংবা ওলী কি কখনও কোন নবীর সমান হতে পারেন ?

উত্তর ঃ কখনও নয়। সাহাবী কিংবা ওলী যত বড় মর্যাদায়ই উন্নীত হন না কেন, কোন নবীর সমান হতে পারেন না।

প্রশ্ন ঃ যে ওলী সাহাবী নন, তিনি কি কোন সাহাবীর সমান কিংবা তাঁর চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারেন ?

উত্তর ঃ না; সাহাবীর মর্যাদা অনেক বড়। সুতরাং এমন কোন ওলী যিনি সাহাবী নন, তিনি কোন সাহাবীর সমান অথবা তাঁর চেয়ে বেশী মর্যাদা লাভ করতে পারেন না।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন লোক শরীঅতবিরোধী কাজ করে যেমন, নামায পড়ে না, দাঁড়ি চেঁচে ফেলে অথচ লোকেরা তাকে ওলী মনে করে। এ ধরনের লোককে ওলী মনে করা কি ?

উত্তর ঃ সম্পূর্ণ ভুল। মনে রাখতে হবে, যে ব্যক্তি শরীঅতের খেলাফ কাজ করবে, সে কখনও ওলী হতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ এমনও কি কোন ওলী হতে পারেন, যার শরীঅতের হুকুম-আহকাম যেমন, নামায, রোযা প্রভৃতি মাফ হয়ে যায় ?

উত্তর ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হুঁশ-জ্ঞান থাকবে এবং তার শক্তি সামর্থ্য বজায় থাকবে, কোন এবাদতই মাফ হয় না কিংবা কোন পাপ কাজই তার জন্য জায়েয হয়ে যায় না। যেসব লোক হুঁশ-জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য বজায় থাকা সত্ত্বেও এবাদত করে না; শরীঅতবিরোধী কাজ করে এবং বলে যে, আমাদের জন্য এসব বিষয় জায়েয, তারা সবাই বেদ্বীন বা ধর্মহীন; এরা আদৌ ওলী হতে পারে না।

মু'জেযা ও কারামতের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ মু'জেযা কাকে বলে ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে কখনও কখনও এমন অস্বাভাবিক বিষয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, যা করতে দুনিয়ার অন্যান্য

লোকেরা অপারক, যাতে এসব বিষয় লক্ষ্য করে মানুষ বুঝতে পারে যে, ইনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত ব্যক্তি। এমনি ধরনের বিষয়কে মু'জেযা বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ নবী-রাসূলগণ কি কি মু'জেযা দেখিয়েছেন ?

উত্তর ঃ নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে অসংখ্য মু'জেযা প্রদর্শন করেছেন। কয়েকটি প্রসিদ্ধ মু'জেযা নিম্নরূপ ঃ

হযরত মূসা (আঃ)-এর আছা তথা হাতের লাঠি সাপ হয়ে জাদুকরদের বানানো সাপগুলোকে গিলে ফেলে। হযরত মূসা (আঃ)-এর হাতে আল্লাহ্ তা'আলা এমন চমক বা দীপ্তি সৃষ্টি করে দিতেন যে, তার আলো সূর্যের আলোকে পর্যন্ত ম্লান করে দিত।

হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্য নীল দরিয়ার মধ্য দিয়ে শুকনো পথ হয়ে গেলে তিনি তাঁর সমস্ত সঙ্গীসাথীসহ সে পথে দরিয়া পার হয়ে যান। যখন ফেরআউনের বাহিনী সে পথে পাড়ি দেয়ার উদ্দেশ্যে দরিয়ার মাঝে গিয়ে পৌঁছায়, অমনি দু'দিকের পানি একত্র হয়ে যায় এবং ফেরআউন তার বাহিনীসহ তাতে ডুবে যায়। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে মৃতকে জীবিত করে দিতেন, জন্মান্ধদেরকে দৃষ্টিদান করতেন, মাটির পাখি বানিয়ে সেগুলোকে জীবিত করে উড়িয়ে দিতেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় মু'জেযা হল কোরআন মজীদ, দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছর অতিবাহিত হবার পরও আজ পর্যন্ত আরবী ভাষার বড় বড় বিজ্ঞ পণ্ডিত নিজেদের যাবতীয় প্রচেষ্টা শেষ করেও কোরআন মজীদের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র সূরাটির মত একটি সূরাও রচনা করতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না।

মহানবী (দঃ)-এর দ্বিতীয় মু'জেযা হল মে'রাজ।

তৃতীয় মু'জেযা 'শাক্কে কমর' বা চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা।

চতুর্থ মু'জেযা হল এই যে, মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার বাতলে দেয়ার দরুন এমন বহু অনাগত বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যা পরে তেমনিভাবে সংঘটিত হয়।

পঞ্চম মু'জেযা হল এই যে, মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'আর বরকতে মাত্র দু'একজনের খাবার শত শত লোক পেট ভরে খেতে পেরেছে। এ ছাড়াও মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু মু'জেযা রয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ তা'লীমুল ইসলামের পরবর্তী খণ্ডে বর্ণনা করা হবে ইন্শাআল্লাহ্।

প্রশ্ন ঃ মে'রাজ কাকে বলে ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় বোরাকে আরোহণ করে মক্কা মুকার্‌রমা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে সাত আসমান পর্যন্ত অতঃপর যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল সেখান পর্যন্ত যান। এ রাতেই তিনি জান্নাত ও দোযখের ভ্রমণ শেষে নিজের জায়গায় ফিরে আসেন। এ ভ্রমণকেই মে'রাজ বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ শাক্কে কমর বা চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ শাক্কে কমরের অর্থ হল এই যে, এক রাতে মক্কার কাফেররা হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমাদেরকে কোন মু'জেযা দেখান। তখন মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন এবং উপস্থিত সবাই তা দেখতে পেল। পরে দু'টি খণ্ড একত্রিত হয়ে মিশে গেল এবং চাঁদটি যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেল।

প্রশ্ন ঃ কারামত কাকে বলে ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য কখনও কখনও তাঁদের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রকাশ করেন, যা সাধারণ অভ্যাসের খেলাফ এবং কঠিন হয়ে থাকে, যা অন্যরা করতে পারে না। এমন সব বিষয়কেই কারামত বলা হয়। নেক বান্দা এবং ওলীআল্লাহ্‌গণের দ্বারা কারামত প্রকাশ পাওয়া সত্য।

প্রশ্ন ঃ মু'জেযা ও কারামতের মাঝে পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ যিনি নবুওত ও রেসালাতের দাবী করেন এবং তাঁর দ্বারা সাধারণ নিয়ম বা অভ্যাসের ব্যতিক্রম কোন বিষয় প্রকাশ পায়, তাকে মু'জেযা বলা হয়। আর যিনি নবুওতের দাবী করেন না; কিন্তু একান্ত মুত্তাকী ও পরহেযগার, তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম শরীঅতের বিধি-বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যদি তাঁর মাধ্যমে এমন অলৌকিক কোন বিষয় প্রকাশ পায়, তবে তাকে কারামত বলা হয়। পক্ষান্তরে শরীঅতবিরোধী বিধর্মী লোকদের দ্বারা যদি কোন অলৌকিক বিষয় প্রকাশ পায়, তবে তাকে 'এস্তেদরাজ' তথা ইন্দ্রজাল বা ভোজবিদ্যা বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ ওলীআল্লাহ্‌গণের মাধ্যমে কারামত প্রকাশ পাওয়া কি অপরিহার্য ?

উত্তর ঃ না, ওলী আল্লাহ্‌র দ্বারা কারামত প্রকাশ পাওয়া কোন জরুরী বিষয় নয়। আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত বন্ধু ও ওলী হওয়া সত্ত্বেও সারা জীবনে তাঁর দ্বারা কোন কারামত প্রকাশ না পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন শরীঅতবিরোধী ভণ্ড ফকীরের দ্বারা এমন বিষয় প্রকাশ পায়, যা সাধারণ নিয়ম বা অভ্যাসের ব্যতিক্রম, সেগুলোকে কি মনে করতে হবে ?

উত্তর ঃ যেসব লোক শরীঅতবিরোধী কাজকর্ম করে, তাদের দ্বারা যদি এমন কোন বিষয় প্রকাশ পায়, তাহলে বুঝতে হবে, সেগুলো যাদু কিংবা ভোজবিদ্যা, কারামত কখনও হতে পারে না। এ ধরনের লোককে ওলী মনে করা এবং তাদের ব্যতিক্রমী বিষয়কে কারামত মনে করা শয়তানের ধোঁকাবিশেষ।

দ্বিতীয় পর্ব

তা'লীমুল আরকান বা ইসলামী আমলসমূহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ط

ওযূর অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ

প্রশ্ন ঃ ওযূ ছাড়া নামায পড়া কি ?

উত্তর ঃ কঠিন গোনাহ্‌র কাজ; বরং কোন কোন আলেম তো যে ব্যক্তি বিনা ওযূতে নামাযে দাঁড়িয়ে যায়, তাকে কাফের পর্যন্ত বলে ফেলেছেন।

প্রশ্ন ঃ নামাযের জন্য ওযূ শর্ত হওয়ার প্রমাণ কি ?

উত্তর ঃ কোরআন মজীদের এ আয়াত ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط (سورة مائدة : ركوع-٢)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াবে, তার আগে নিজের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নেবে এবং মাথা মাসেহ করবে, অতঃপর গিঁঠ পর্যন্ত পা ধুয়ে নেবে। (সূরা মা-ইদাহ্, রুকূ ২) আর রাসূলে করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন ঃ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ অর্থাৎ, পবিত্রতা হল নামাযের চাবি (অর্থাৎ, শর্ত)। (তিরমিযী)

ওযূর ফরয সংক্রান্ত অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ

প্রশ্ন ঃ যাকে ধোয়া বলা যায়, তার সীমা কতটুকু ?

উত্তর ঃ এ পরিমাণ পানি ঢালা যাতে অঙ্গের উপর প্রবাহিত হয়ে দু'এক ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। একে ধোয়ার নিম্নতর পর্যায় বলা যায়। এর চাইতে কমকে ধোয়া বলা যায় না। যেমন, কেউ যদি হাত ভিজিয়ে মুখের উপর ফেরায় কিংবা এত অল্প পরিমাণ পানি মুখে ঢালে যে, তা বেয়ে মুখের উপরই থেকে যায়; বাইরে না গড়ায়, তাহলে বলা যাবে না যে, সে মুখ ধুয়েছে এবং তার ওযূ শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন ঃ ওযূতে যেসব অঙ্গ ধোয়া ফরয, সেগুলোকে কতবার ধুলে ফরয আদায় হবে ?

উত্তর ঃ একবার ধোয়া ফরয। তার চেয়ে বেশী তিনবার ধোয়া সুন্নত। আর তিনবারের অতিরিক্ত ধোয়া নাজায়েয ও মাকরূহ।

প্রশ্ন ঃ কোন্খান থেকে কোন্খান পর্যন্ত মুখ ধোয়া ফরয ?

উত্তর ঃ কপালের চুলের জায়গা থেকে থুঁতনী বা চিবুকের নীচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত মুখ ধোয়া ফরয।

প্রশ্ন ঃ যে সব অঙ্গ ধোয়া ফরয, সেগুলোর মধ্যে যদি কোনটির সামান্য স্থানও শুকনো থেকে যায়, তাহলে ওযূ শুদ্ধ হবে কিনা ?

উত্তর ঃ এক চুল পরিমাণ কোন জায়গাও যদি শুকনো থেকে যায়, তবে ওযূ হবে না।

প্রশ্ন ঃ কারো হাতে যদি ছ'টি আঙ্গুল থাকে, তবে ষষ্ঠ আঙ্গুলটি ধোয়া ফরয কিনা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তা-ও ফরয। আর এমনিভাবে সেসব জায়গায় অতিরিক্ত যাই কিছু জন্মাক যা ধোয়া ফরয, তার সে অতিরিক্তটি ধোয়াও ফরয হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ মাসেহ্ করার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ পানিতে হাত ভিজিয়ে কোন অঙ্গের উপর ফেরানোকে মসেহ্ বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ মাথা মাসেহ্ করার জন্য নূতন পানি নেয়া জরুরী নাকি হাতের অবশিষ্ট ভেজাই যথেষ্ট ?

উত্তর ঃ নূতন পানি নেয়া উত্তম। কিন্তু হাত ধোয়ার পর অবশিষ্ট ভেজার দ্বারা মাসেহ্ করে নিলেও যথেষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু হাতের দ্বারা একবার কোন জায়গা মাসেহ্ করে নিলে তার দ্বারা অন্য জায়গা মাসেহ্ করা জায়েয নয়। তেমনিভাবে যদি হাত ভেজা না থাকে এবং অন্য কোন অঙ্গের

ভেজায় কিংবা মাসেহকৃত অঙ্গ হতে তা ভিজিয়ে নেয়া হয়, তবে তার দ্বারাও মাসেহ করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন ঃ খোলা মাথায় যদি বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে এবং শুকনো হাত সে ভেজা মাথায় ফিরিয়ে দেয় এবং তাতে বৃষ্টির পানি মাথায় ছড়িয়ে যায়, তবে মাসেহ আদায় হয়ে যাবে কিনা ?

উত্তর ঃ আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ ওযূতে চোখের ভেতরের অংশ ধোয়া ফরয কিনা ?

উত্তর ঃ চোখের ভেতরের অংশ, নাকের ভেতরের অংশ এবং মুখের ভেতরের অংশ ধোয়া ফরয নয়।

প্রশ্ন ঃ ওযূ করার পর যদি মাথা মুড়ানো হয় কিংবা নখ কাটা হয়, তাহলে পুনরায় মাথা মাসেহ করা কিংবা নখগুলো পুনরায় ধোয়া জরুরী কিনা ?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ কারো হাতে যদি কনুইর নীচে কাটা থাকে, তাহলে সে হাতটি ধোয়া জরুরী কিনা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত কনুই কিংবা তার নীচের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকবে, তখন অবশিষ্ট অংশটি ধোয়া জরুরী।

ওযূর সুন্নত সংক্রান্ত অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ

প্রশ্ন ঃ ওযূতে যদি নিয়ত না করে, তবে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ যদি ওযূর নিয়ত না করে, যেমন নদীতে পড়ে যায় কিংবা বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাতে ওযূর সমস্ত অঙ্গে পানি বয়ে যায়, তাহলে ওযূ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, সে ওযূর দ্বারা নামায পড়া জায়েয হবে। কিন্তু ওযূর সওয়াব পাবে না।

প্রশ্ন ঃ ওযূর নিয়ত করতে হয় কিভাবে ?

উত্তর ঃ নিয়ত অর্থ হল ইচ্ছা করা। যখন ওযূ করবে, তখন ইচ্ছা করবে যে, নাপাকী অপসারণ করতে, পবিত্রতা অর্জন করতে এবং নামায জায়েয হওয়ার জন্য ওযূ করছি। এই ইচ্ছা ও ধারণা করে নেয়াই ওযূর নিয়ত।

প্রশ্ন ঃ নিয়ত মুখে বলা জরুরী কিনা ?

উত্তর ঃ মুখে বলা জরুরী নয়, তবে বললে কোন দোষও নেই।

প্রশ্ন ঃ ওযূ থাকা অবস্থায় নূতন ওযূ করতে গেলে কি নিয়ত করবে ?

উত্তর ঃ এ নিয়ত করবে যে, ওযূর ফযীলত ও সওয়াব অর্জনের জন্য ওযূ করছি।

প্রশ্ন ঃ ওযূ করতে গিয়ে পুরো বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে হবে কিনা?

উত্তর ঃ পুরো بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া অথবা بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ কিংবা بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ তিনোভাবে পড়াই জায়েয।

প্রশ্ন ঃ মেসওয়াক করা কি এবং এর নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ মেসওয়াক করা সুন্নতে মুআক্কাদা। এতে বিরাট সওয়াব এবং এর বহু উপকারিতা রয়েছে। মেসওয়াক কোন তেতো গাছের জড় কিংবা ডাল হওয়া উচিত। যেমন, পিলোর জড় কিংবা নিমের ডাল ইত্যাদি। মেসওয়াক এক বিঘতের বেশী লম্বা হওয়া উচিত নয়। ধুয়ে মেসওয়াক করবে এবং ধুয়ে রাখবে। প্রথমে ডান দিকের দাঁত এবং পরে বাঁ দিকের দাঁত মাজবে। তিনবার মেসওয়াক করা এবং প্রতিবার নূতন পানি নেয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ গরগরা করা কি ?

উত্তর ঃ ওযূ ও গোসলে গরগরা করা সুন্নত। কিন্তু রোযা অবস্থায় করা উচিত নয়। ডান হাতে কুল্লি করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ নাকে পানি দেয়ার নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ ডান হাতে পানি নিয়ে নাকে লাগাবে এবং শ্বাস টেনে পানি নাকে ঢুকাবে। কিন্তু এত বেশী টানবে না, যাতে মস্তকে চলে যায়। রোযাদার হলে হাতে পানি নিয়ে নাকে ঢুকাবে, তবে শ্বাস টানবে না। কুল্লি করা এবং নাকে পানি ঢুকানো উভয়টিই সুন্নতে মুআক্কাদা।

প্রশ্ন ঃ দাড়ির কোন্ অংশ খেলাল করা সুন্নত ?

উত্তর ঃ দাড়ির নীচে এবং ভেতরের চুলগুলোতে খেলাল করা সুন্নত। আর যে চুলগুলো চেহারার দিকে চেহারার চামড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে, সেগুলো ধোয়া ফরয।

প্রশ্ন ঃ আঙ্গুলগুলো কেমন করে খেলাল করা উচিত ?

উত্তর ঃ হাতের আঙ্গুলগুলো উত্তমরূপে খেলাল করবে। এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মাঝে ঢুকিয়ে ঘষে দেবে। আর পায়ের আঙ্গুলগুলো বাঁ হাতের কনিষ্ঠা (সর্বাপেক্ষা ছোট) আঙ্গুল দ্বারা খেলাল করবে। ডান

পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুল থেকে আরম্ভ করতে হবে এবং বাঁ পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলে শেষ করবে।

প্রশ্ন ঃ পুরো মাথা কেমন করে মাসেহ্ করা উচিত ?

উত্তর ঃ উভয় হাত পানিতে ভিজিয়ে মাথার দু'দিকে কপালের চুলের জায়গার উপর রাখবে এবং হাতের তালু আঙ্গুলসহ ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে ঘুরিয়ে আনবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সারা মাথায় হাত ঘুরে যায়।

প্রশ্ন ঃ কান মাসেহ্ করার জন্য নূতন পানি নেয়া উচিত কিনা ?

উত্তর ঃ না; মাথা মাসেহ করার জন্য যে পানি নেয়া হয়েছিল তা-ই যথেষ্ট। কানের ভেতরের মাসেহ্ শাহাদত আঙ্গুল (তর্জনী)-এর দ্বারা করা উচিত।

ওযূর অবশিষ্ট মুস্তাহাব বিষয়সমূহ

প্রশ্ন ঃ ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নত, না মুস্তাহাব ?

উত্তর ঃ কোন কোন আলেম একে সুন্নত এবং কোন কোন আলেম মুস্তাহাব বলেছেন।

প্রশ্ন ঃ গর্দান মাসেহ্ করার পদ্ধতি কি ?

উত্তর ঃ গর্দানের উপরে উভয় হাতের আঙ্গুলের পিঠ দিয়ে মাসেহ্ করা উচিত। গলার উপর মাসেহ্ করা বেদআত।

প্রশ্ন ঃ ওযূর আর কি কি আদব রয়েছে ?

উত্তর ঃ ওযূর আদব অনেক, যেমন (১) কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাথা ভিজিয়ে কানের ছিদ্র পরিষ্কার করা, (২) নামাযের সময়ের পূর্বে ওযূ করা, (৩) অঙ্গসমূহ ধোয়ার সময় হাতে ঘষা, (৪) আংটি বা রিং নাড়ানো, (৫) পার্থিব কথাবার্তা না বলা, (৬) মুখের উপর জোরে পানি না মারা, (৭) অতিরিক্ত পানি ব্যয় না করা, (৮) প্রত্যেকটি অঙ্গ ধোয়ার সময় বিস্ মিল্লাহ্ পড়া, (৯) ওযূর পর দুরূদ শরীফ পড়া, (১০) ওযূর পর কলেমা শাহাদত ও এ দো'আ পাঠ করা ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ–

(১১) ওযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করে নেয়া এবং (১২) ওযূ করার পর দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল ওযূর নামায পড়া প্রভৃতি।

ওযূ ভাঙ্গার অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ

প্রশ্ন ঃ নাপাক বস্তু শরীর থেকে বেরিয়ে কতটা প্রবাহিত হয়ে গেলে ওযূ ভেঙ্গে যায় ?

উত্তর ঃ ওযূ কিংবা গোসলে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া ফরয, শরীর থেকে কোন নাপাক বস্তু বেরিয়ে তাতে প্রবাহিত হলে তা অল্প হলেও ওযূ ভেঙ্গে যায়।

প্রশ্ন ঃ চোখের ভেতরে রক্তক্ষরণ হয়ে যদি তা চোখের ভেতরেই থেকে যায়; বাইরে প্রবাহিত না হয়, তবে ওযূ ভেঙ্গে যাবে কিনা ?

উত্তর ঃ ভঙ্গ হবে না। কারণ, চোখের ভেতরের অংশ না ওযূতে ধোয়া ফরয, না গোসলে।

প্রশ্ন ঃ যদি যখম বা ক্ষতের উপর রক্ত দেখা দেয় এবং তা আঙ্গুল বা কাপড় দিয়ে মুছে দেয়, আবারও দেখা দেয় এবং আবারও মুছে নেয়, এমনিভাবে কয়েকবার করে, তাহলে ওযূ ভঙ্গ হবে কিনা ?

উত্তর ঃ এখানে দেখতে হবে, যদি রক্ত মুছে নেয়া না হত, তবে তা প্রবাহিত হওয়ার মত ছিল কিনা, যদি এত পরিমাণ ছিল যে, প্রবাহিত হত, তবে ওযূ ভেঙ্গে যাবে। আর তার কম হলে ওযূ ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন ঃ বমি করতে গিয়ে কি বের হলে ওযূ ভেঙ্গে যাবে ?

উত্তর ঃ বমি করতে গিয়ে পিত, রক্ত, খাবার কিংবা পানি বের হলে এবং তা মুখ ভরে বের হলে ওযূ ভেঙ্গে যাবে। আর যদি শুধু কফ বের হয়, তাহলে ওযূ ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন ঃ অল্প অল্প বমি কয়েকবার হলে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ একবারের বমনোদ্রেকে যদি কয়েকবার বমি হয় এবং তার পরিমাণ যদি মুখ ভরে যাবার মত হয়, তাহলে ওযূ ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য যদি একবারের বমনোদ্রেকে সামান্য বমি হয়ে তা প্রশমিত হয়ে যায় এবং পুনরায় বমনোদ্রেক সৃষ্টি হয়ে সামান্য বমি হয়, তাহলে উভয়টিকে একত্রিত করা হবে না এবং তাতে ওযূও ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন ঃ যদি শরীরের কোথাও ব্রণ বা ফুস্কুড়ি থাকে আর তা থেকেও পুঁজ বা রক্তের দাগ কাপড়ে লেগে যায়, তবে কাপড় নাপাক হবে কিনা ?

উত্তর ঃ যদি পুঁজ বা রক্ত বেরিয়ে প্রবাহিত হওয়ার যোগ্য না হয়, শুধু তাতে কাপড় লাগলে দাগ বসে যায়, তাহলে সে কাপড় নাপাক হবে না। কিন্তু তবুও ধুয়ে ফেলা উত্তম।

প্রশ্ন ঃ বমি যদি মুখ ভরে না হয়, তবে তা নাপাক কিনা ?

উত্তর ঃ না, নাপাক নয়।

প্রশ্ন ঃ যদি জোঁক শরীরে চিমটে গিয়ে রক্ত পান কর এবং ভরে যায়, কিংবা মশা-মাছি কামড়ে রক্ত বের করে নেয়, তাহলে ওযূ ভঙ্গ হবে কিনা?

উত্তর ঃ জোঁকের রক্ত পানে ওযূ ভেঙ্গে যাবে। যদি সেটিকে ছাড়ানোর পর কাটা ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত না-ও হয়। কারণ, জোঁক এত অধিক পরিমাণ রক্ত পান করে যে, যদি তা শরীর থেকে বেরিয়ে তার পেটে চলে না যেত, তবে নিশ্চয়ই তা প্রবাহিত হত। আর মশা-মাছির কামড়ে ওযূ ভাঙ্গে না। কারণ, এগুলো খুবই সামান্য রক্ত পান করে যা প্রবাহিত হওয়ার মত নয়।

প্রশ্ন ঃ কি ধরনের ঘুমের কারণে ওযূ ভঙ্গ হয় না ?

উত্তর ঃ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়া কিংবা কোন কিছুতে হেলান দেয়া ছাড়া বসে বসে ঘুমানো অথবা নামাযের কোন অবস্থায় ঘুমিয়ে গেলে ওযূ ভাঙ্গে না। যেমন, সজদায় কিংবা কা'দাহ তথা বসা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে ওযূ ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন ঃ এমন কোন লোকও কি আছে, ঘুমিয়ে গেলেও যার ওযূ ভাঙ্গে না ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, নবী রাসূলগণের ওযূ ঘুমেও ভঙ্গ হত না। এটা তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মর্যাদা ছিল।

প্রশ্ন ঃ নামাযে অট্টহাসি বা খিলখিলিয়ে হাসলে কি সবারই ওযূ ভেঙ্গে যায় ? তাছাড়া অট্টহাসি কাকে বলে ?

উত্তর ঃ অট্টহাসি বলা হয় এমন জোরে হাসাকে, যার শব্দ অন্যান্য পার্শ্ববর্তীরা শুনতে পাবে। নামাযে অট্টহাসির দরুন ওযূ ভেঙ্গে যাবার শর্ত হল ঃ (১) হাস্যকারী সাবালগ পুরুষ বা নারী হতে হবে। কারণ, নাবালেগের অট্টহাসিতে ওযূ নষ্ট হয় না। (২) জাগ্রত অবস্থায় হাসলে। সুতরাং যদি নামাযের ভেতরে ঘুমিয়ে পড়ে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় অট্টহাসিতে হাসে, তাহলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। (৩) যে নামাযে হাসল তা রুকূ' সজদাবিশিষ্ট নামায হতে হবে। কাজেই জানাযার নামাযে অট্টহাসিতে ওযূ ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন ঃ অন্য কারো সতরের প্রতি নজর পড়ে গেলে কি ওযূ ভেঙ্গে যাবে ?

উত্তর ঃ নিজের কিংবা অন্য কারো সতরের উপর ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছায় নজর পড়ে গেলে ওযূ ভঙ্গ হবে না।

গোসলের অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ

প্রশ্ন ঃ গোসল কত প্রকার ?

উত্তর ঃ তিন প্রকার ঃ (১) ফরয, (২) সুন্নত ও (৩) মুস্তাহাব।

প্রশ্ন ঃ ফরয গোসল কত প্রকার ?

উত্তর ঃ ছ' প্রকার। আর এর বিষদ বিবরণ তা'লীমুল ইসলামের পরবর্তী কোন খণ্ডে আসবে।

প্রশ্ন ঃ সুন্নত গোসল কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ সুন্নত গোসল চার প্রকার। আর তা এইরূপ ঃ (১) জুমুআর নামাযের উদ্দেশ্যে গোসল করা, (২) দু' ঈদের নামাযের জন্য গোসল করা, (৩) হজ্জের এহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা এবং (৪) আরাফাতে ওকুফ বা অবস্থান করার জন্য গোসল করা।

প্রশ্ন ঃ মুস্তাহাব গোসল কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ মুস্তাহাব গোসল অনেক রকম। তার কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ (১) শা'বান মাসের পনেরতম রাতে অর্থাৎ, শবে বরাতের গোসল করা, (২) যিলহজ্জ মাসের ৮ম তারিখ দিবাগত রাতে, অর্থাৎ, আরাফার রাতে গোসল করা, (৩) সূর্য কিংবা চন্দ্র গ্রহণের নামায পড়ার জন্য গোসল করা, (৪) এস্তেসকা বা বৃষ্টির জন্য নামায পড়ার উদ্দেশ্যে গোসল করা, (৫) মক্কা মুকার্‌রমা কিংবা মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে গোসল করা, (৬) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর গোসলদাতার গোসল করা, (৭) অমুসলমান ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করা প্রভৃতি।

প্রশ্ন ঃ যদি গোসলের প্রয়োজন হয় এবং নদীতে ডুব দিয়ে ফেলে কিংবা বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং তাতে সমস্ত শরীরে পানি বয়ে যায়, তবে গোসল হয়ে যাবে কিনা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, গোসল হয়ে যাবে, যদি কুল্লি করে এবং নাকে পানি দিয়ে নেয়।

প্রশ্ন ঃ গোসল করার সময় কেবলার দিকে মুখ করা জায়েয কিনা ?

উত্তর ঃ গোসল করার সময় শরীর যদি অনাবৃত থাকে, তবে কেবলার দিকে মুখ করা জায়েয নয়। আর যদি সতর আবৃত থাকে তবে ক্ষতি নেই।

প্রশ্ন ঃ সতর খুলে গোসল করা কি ?

উত্তর ঃ গোসলখানার ভেতরে কিংবা এমন কোন জায়গায় যেখানে অন্য কারো নজর তার সতরের উপর পড়বে না, সেখানে নগ্ন দেহে গোসল করা জায়েয।

প্রশ্ন ঃ গোসলে মাকরূহ কি কি ?

উত্তর ঃ (১) বেশী পানি ঢালা, (২) সতর খোলা অবস্থায় কথা বলা কিংবা কেবলার দিকে মুখ করা, (৩) সুন্নতের খেলাফ গোসল করা প্রভৃতি।

প্রশ্ন ঃ গোসলের পূর্বে ওযূ না করে থাকলে গোসলের পর নামাযের জন্য ওযূ করা জরুরী কিনা ?

উত্তর ঃ গোসলের ভেতরে ওযূও হয়ে যায়, পুনরায় ওযূ করার দরকার নেই।

মোজার উপর মাসেহ্ করার অন্যান্য মাসআলা

প্রশ্ন ঃ মাসেহের সময় কখন থেকে হিসাব করতে হবে ?

উত্তর ঃ যখন ওযূ ভাঙ্গে তখন থেকে এক দিন এক রাত অথবা তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসেহ করা জায়েয। যেমন, শুক্রবার ভোরে ওযূ করে মোজা পরা হল এবং সে ওযূ যোহরের সময় শেষ হওয়ার পর ভেঙ্গে গেল, তখন লোকটি যদি মুকীম হয়, তবে শনিবার যোহরের সময় পর্যন্ত মাসেহ্ করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ মাসেহ কি কি কারণে নষ্ট হয় ?

উত্তর ঃ যেসব কারণে ওযূ ভেঙ্গে যায়, সেসব কারণে মাসেহ্ও ভেঙ্গে যায়। তাছাড়া (১) মাসেহের সময় পেরিয়ে গেলে কিংবা (২) মোজা খুলে ফেললে কিংবা (৩) তিন আঙ্গুল পরিমাণ মোজা ছিঁড়ে গেলে মাসেহ নষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ওযূর অবস্থায় মোজা খুলে ফেললে কিংবা ওযূ থাকা অবস্থায় মাসেহের সময় পূর্ণ হয়ে গেলে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ এতদুভয় অবস্থায় শুধু পা ধুয়ে মোজা পরে নিলেই চলবে। তবে পুরো ওযূ করে নেয়া মুস্তাহাব।

প্রশ্ন ঃ কোন মুসাফির ব্যক্তি যদি মোজার উপর মাসেহ করা শুরু করে এবং এক দিন এক রাত পরেই বাড়ি ফিরে আসে, তাহলে কি করতে হবে ?

উত্তর ঃ মোজা খুলে ফেলবে এবং নূতনভাবে মাসেহ করবে।

প্রশ্ন ঃ কোন মুকীম ব্যক্তি যদি মোজার উপর মাসেহ করার পর সফরে চলে যায়, তবে সে কি করবে ?

উত্তর ঃ যদি এক দিন এক রাত পূর্ণ হবার আগেই সফর করে, তবে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোজা পরে রাখবে এবং মাসেহ করতে থাকবে। আর যদি এক দিন এক রাত পূর্ণ হবার পর সফর করে, তাহলে মোজা খুলে নূতনভাবে মাসেহ শুরু করবে।

প্রশ্ন ঃ মোজা যদি কয়েক জায়গায় সামান্য সামান্য ছেঁড়া থাকে, তবে কি করবে ?

উত্তর ঃ একটি মোজা যদি কয়েক জায়গায় সামান্য সামান্য ছেঁড়া হয়, তবে সবগুলো ছেঁড়া একত্রিত করে দেখতে হবে। যদি সবগুলো ছেঁড়া মিলে তিন আঙ্গুল পরিমাণ হয়ে যায়, তবে সে মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নয়; কম হলে জায়েয। আর দু'টি মোজাই যদি ছেঁড়া থাকে এবং দু'টি ছেঁড়া মিলে তিন আঙ্গুলের সমান হয়; কিন্তু প্রত্যেকটি ছেঁড়া তিন আঙ্গুলের কম হয়, তবে মাসেহ করা জায়েয।

নাজাসাতে হাকীকিয়্যাহ ও তার পবিত্রতার অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ

প্রশ্ন ঃ চামড়া নির্মিত সামগ্রী যেমন মোজা, জুতা, বেল্ট প্রভৃতিতে যদি কোন গাঢ় অপবিত্রতা লেগে যায়, তবে তা পাক করার উপায় কি ?

উত্তর ঃ মাটিতে কিংবা অন্য কোন বস্তুর দ্বারা ঘর্ষে পরিষ্কার করে ফেললেই তা পাক হয়ে যায়, যদি সে ঘষার দরুন মূল অপবিত্র বস্তু ও তার চিহ্ন অপসারিত হয়।

প্রশ্ন ঃ উল্লিখিত সেসব সামগ্রীতে যদি পেশাব, শরাব কিংবা এমনি ধরনের কোন নাপাকী লেগে যায়, তবে তা কেমন করে পাক করতে হবে ?

উত্তর ঃ পানি অথবা অপর কোন পাক তরল পদার্থের দ্বারা ধুয়ে পাক করতে হবে, যা নাপাকীর চিহ্ন অপসারণ করতে পারে। অর্থাৎ, গাঢ় নাপাকী ছাড়া অন্য নাপাকী লেগে গেলে ঘষে দিলেই চামড়ার জিনিস পাক হবে না; বরং ধোয়া জরুরী।

প্রশ্ন ঃ চাকু, ছুরি, তলোয়ার, লোহা, রূপা, তামা কিংবা এলুমিনিয়াম প্রভৃতি নির্মিত সামগ্রী নাপাক হয়ে গেলে তা না ধুয়ে পাক করা যায় কিনা ?

উত্তর ঃ লোহার সামগ্রী পরিষ্কার হলে অর্থাৎ, মরচে ধরা না হলে এবং সোনা, রূপা, তামা, এলুমিনিয়াম, পিতল প্রভৃতি ধাতু নির্মিত বস্তু-সামগ্রী,

কাঁচের জিনিস কিংবা হাতির দাঁত বা হাড় নির্মিত সামগ্রী অথবা চীনা মাটির পাত্র- এ সব সামগ্রী পরিষ্কার এবং নকশাদার না হলে এমন ঘষা-মাজাতে পাক হয়ে যাবে, যাতে নাপাকীর চিহ্ন অপসারিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ নকশাদার না হওয়ার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ অর্থাৎ, সেগুলোতে এমন কারুকাজ থাকবে না, যাতে সেগুলোর দেহ উঁচু নীচু হয়ে যায়। কারণ, এমন ধরনের কারুকাজের উপর ঘষা-মাজা করলেও নাপাকী থেকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য যদি রং বা পেইন্টের সমান নকশা করা হয়, তবে এগুলো ঘষা-মাজাতেই পাক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ মাটির উপর পেশাব ও শরাব জাতীয় নাপাকী পড়ে গেলে তা কেমন করে পাক করা যাবে ?

উত্তর ঃ মাটি শুকিয়ে গিয়ে নাপাকীর চিহ্ন, রং, গন্ধ, আস্বাদ প্রভৃতি চলে গেলে তা পাক হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ঘর কিংবা মসজিদ প্রভৃতির পাকা ইট অথবা পাথরের মেজে বা দেয়ালে নাপাকী লেগে গেলে তা কেমন করে পাক করতে হয় ?

উত্তর ঃ দালানে লাগানো ইট অথবা পাথর শুকিয়ে গেলে এবং নাপাকীর চিহ্ন চলে গেলে তা পাক হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ যেসব বস্তু-সামগ্রী ধুতে গিয়ে নিংড়ানো যায় না, যেমন তামার পাত্রাদি কিংবা মোটা গদি প্রভৃতি সেগুলো পাক করতে হলে কিভাবে ধুতে হবে ?

উত্তর ঃ যেসব বস্তু-সামগ্রী চিপা বা নিংড়ানো অসম্ভব বা কঠিন, সেগুলো ধোয়ার নিয়ম হল এই যে, একবার ধুয়ে রেখে দেবে, যখন তা থেকে পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যাবে, তখন দ্বিতীয় বার ধুয়ে তেমনি রেখে দেবে, আবারো যখন পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তৃতীয় বার ধুয়ে ফেলবে। এতে সেটি পাক হয়ে যাবে। কিন্তু ধুতে গিয়ে এমনভাবে ঘষা-মাজা করতে হবে, যাতে যথাসম্ভব নাপাকী বেরিয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ মাটির পাত্র নাপাক হয়ে গেলে তা পাক হতে পারে কিনা ?

উত্তর ঃ মাটির পাত্রও ধুলে পাক হয়ে যায় এবং সেগুলো পাক করার পদ্ধতিও তা-ই, যা পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ নাপাক বস্তু, যেমন গোবর প্রভৃতি জ্বলে পুড়ে ছাই-ভস্ম হয়ে গেলে সে ছাই বা ভস্ম পাক কিনা ?

উত্তর ঃ নাপাক কোন বস্তু জ্বলে ছাই হয়ে গেলে সে ছাই পাক।

প্রশ্ন ঃ ঘিতে ইঁদুর পড়ে মরে গেলে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ ঘি যদি জমাট বাঁধা থাকে, তাহলে মৃত ইঁদুর এবং আশপাশের ঘি তুলে ফেলে দিতে হবে, অবশিষ্ট ঘি পাক থাকবে। আর যদি তরল থাকে, তবে সম্পূর্ণ ঘি-ই নাপাক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ নাপাক ঘি বা তেল কেমন করে পাক করা যায় ?

উত্তর ঃ নাপাক ঘি বা তেলে সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে। অতঃপর যে ঘি বা তেল পানির উপর এসে যায় তা তুলে নিতে হবে। এভাবে তিন বার করলে সে ঘি বা তেল পাক হয়ে যাবে।

এস্তেঞ্জার অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ

প্রশ্ন ঃ এস্তেঞ্জার কোন্ কোন্ উপায় মাকরূহ ?

উত্তর ঃ (১) কেবলার দিকে মুখ করে অথবা পেছন ফিরে এস্তেঞ্জা করা, (২) এমন জায়গায় এস্তেঞ্জা করা যেখানে এস্তেঞ্জাকারীর সতরের উপর অন্য কারো নজর পড়ে।

প্রশ্ন ঃ পায়খানা বা পেশাব করার সময় কি কি বিষয় মাকরূহ ?

উত্তর ঃ (১) কেবলার দিকে মুখ করে অথবা পেছন ফিরে পেশাব-পায়খানা করা, (২) দাঁড়িয়ে পেশাব করা, (৩) নালা কিংবা কুয়ার ভেতরে অথবা (৪) সেগুলোর পাশে পেশাব-পায়খানা করা, (৫) মসজিদের দেয়াল ঘেষে কিংবা (৬) কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা করা, (৭) ইঁদুরের গর্ত কিংবা অন্য কোন ছিদ্রের ভেতরে পেশাব করা, (৮) পেশাব-পায়খানা করার সময় কথা বলা, (৯) নীচু জায়গায় বসে উঁচু জায়গায় পেশাব করা, (১০) মানুষের বসার কিংবা চলাফেরার জায়গায় পেশাব-পায়খানা করা, (১১) ওযূ কিংবা গোসল করার জায়গায় পেশাব-পায়খানা করা এ সবই মাকরূহ।

পানি সংক্রান্ত অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ

প্রশ্ন ঃ রোদের তাপে গরম হওয়া পানির দ্বারা ওযূ করা জায়েয কিনা ?

উত্তর ঃ জায়েয বটে; কিন্তু ভাল নয়।

প্রশ্ন ঃ ওযূ করার সময় শরীর থেকে পানির ফোঁটা পাত্রে পড়লে সে পানির দ্বারা ওযূ জায়েয কিনা ?

উত্তর ঃ ওযূ করার সময় শরীর থেকে যে পানি পড়ে, যদি শরীরে কোন রকম নাজাসাতে হাকীকিয়্যাহ বা প্রকৃত নাপাকী না থাকে, তবে সে পানিকে মুস্‌তা'মাল বা ব্যবহৃত পানি বলা হয়। এই ব্যবহৃত পানি যদি অব্যবহৃত (গায়ের মুস্‌-তা'মাল) পানির সাথে মিশে যায়, তবে তার হুকুম হল এই যে, যে পর্যন্ত ব্যবহৃত পানির পরিমাণ অব্যবহৃত পানির চাইতে কম থাকে, সে পর্যন্ত তার দ্বারা ওযূ কিংবা গোসল জায়েয। পক্ষান্তরে যদি ব্যবহৃত পানির পরিমাণ অব্যবহৃত পানির সমান বা বেশী হয়ে যায়, তবে তার দ্বারা ওযূ কিংবা গোসল জায়েয নয়।

প্রশ্ন ঃ পানিতে যদি সাবান কিংবা জা'ফরানের মত কোন পাক বস্তু মিশে যায়, তাহলে তার দ্বারা ওযূ জায়েয কিনা ?

উত্তর ঃ পানিতে কোন পাক বস্তু মিশে গেলে তাতে দু'একটি গুণ বদলে গেলেও ওযূ করা জায়েয থাকে। অবশ্য তিনটি গুণই যদি বদলে যায় এবং পানি যদি গাঢ় হয়ে যায়, তাহলে ওযূ নাজায়েয হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ পুকুর বা হাউজ যদি শরীঅত নির্ধারিত গজে দু'গজ প্রস্থ্ এবং পঞ্চাশ গজ দীর্ঘ হয় কিংবা চার গজ প্রস্থ্ ও পঁচিশ গজ দীর্ঘ হয় অথবা পাঁচ গজ প্রস্থ্ ও কুড়ি গজ দীর্ঘ হয়, তবে তা প্রবাহিত পানির হুকুমে পড়বে কিনা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তা বহমান পানির হুকুমে পড়বে।

প্রশ্ন ঃ যদি হাউজের খোলা মুখটি শরীঅত নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়; কিন্তু তার নীচের অংশ তদপেক্ষা অনেক বেশী প্রশস্ত হয়, তবে তার পানি বড় হাউজ এবং প্রবাহিত পানির হুকুমে পড়বে কিনা ?

উত্তর ঃ হাউজ যদি দশ গজ লম্বা ও দশ গজ চওড়া হয়; কিন্তু তার চার দিক অথবা যে কোন এক বা দু'দিক থেকে তার মুখটি ঢেকে দেয়া হয়, তখন যদি সে ঢাকনা বা আবরণ পানি থেকে উপরে ও আলাদা থাকে, তবে সে হাউজটি ঠিকই থাকে এবং তার পানি প্রবাহিত পানিরই হুকুমে পড়ে। পক্ষান্তরে সে আবরণটি যদি পানির সাথে লেগে থাকে, তবে সে হাউজটি ঠিক নয় এবং অল্প পানির হুকুমে পড়বে। সারকথা হল এই যে, পানির সে অংশই গ্রহণযোগ্য যতটা উপর দিক থেকে খোলা থাকে। অর্থাৎ, কোন কিছুর সাথে সংলগ্ন না থাকে, তার পরিমাণ

শরীঅত নির্ধারিত পরিমাণের সমান হতে হবে। যদি খোলা অংশটি কম হয়, তাহলে নীচের দিকে যত বিরাটই হোক, তা ধর্তব্য নয়।

কুয়ার অবশিষ্ট মাসআলা

প্রশ্ন ঃ কুয়াতে যদি কবুতর কিংবা চড়ুই পাখির বিষ্ঠা পড়ে যায়, তবে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ কবুতর ও চড়ুইর বিষ্ঠা কিংবা উট, বকরি ও ভেড়ার দু'চারটি বিষ্ঠাবড়িতে কুয়া নাপাক হয় না।

প্রশ্ন ঃ কুয়াতে যদি বালতি তোলার জন্য কোন কাফের নেমে পড়ে এবং পানিতে ডুব দেয়, তবে এ কুয়ার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ কুয়াতে নামার আগে যদি সে কাফেরকে গোসল করিয়ে দেয়া হয় এবং পাক কাপড়ে তার সতর বেঁধে কুয়াতে নামানো হয়, তাহলে কুয়া পাক থাকবে। পক্ষান্তরে নামার আগে যদি গোসল না করে থাকে এবং নিজের ব্যবহৃত কাপড়েই নেমে যায়, তাহলে কুয়ার সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে। কারণ, কাফেরদের শরীর ও পোশাকাদি অধিকাংশ সময় নাপাকই থাকে।

প্রশ্ন ঃ কুয়াতে যদি নির্ধারিত কোন বালতি না থাকে; বরং লোকেরা ছোট-বড় বিভিন্ন রকম বালতিতে পানি তুলে, তবে সে কুয়াকে পাক করতে হলে কোন্ বালতির দ্বারা পানি তুলে ফেলতে হবে ?

উত্তর ঃ কুয়াতে যখন কোন নির্দিষ্ট বালতি না থাকে কিংবা কুয়ার বিশেষ বালতিটি যখন খুবই বড় কিংবা অত্যন্ত ছোট আকারের হয়, তখন এসব ক্ষেত্রে মাঝারি ধরনের বালতি ধর্তব্য হবে। মাঝারি বালতি বলতে এমন বালতিকে বুঝানো হয়, যাতে আশি তোলার সেরে সাড়ে তিন সের পানি ধরে।

এ পর্যন্ত তা'লীমুল ইসলামের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত বিষয়গুলোর উপর সংযোজন ছিল। এখান থেকে পরবর্তী বিষয়সমূহের আলোচনা আরম্ভ হচ্ছে।

তাইয়াম্মুমের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ তাইয়াম্মুম কাকে বলে ?

উত্তর ঃ পাক মাটি কিংবা মাটির পর্যায়ভুক্ত কোন বস্তুর দ্বারা শরীরকে

নাজাসাতে হুকমিয়্যাহ্ বা আদিষ্ট নাপাকী থেকে পাক করাকে তাইয়াম্মুম বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ তাইয়াম্মুম কখন জায়েয ?

উত্তর ঃ যখন পানি পাওয়া না যায় কিংবা পানির ব্যবহারে অসুস্থ্ হয়ে পড়ার অথবা রোগ বেড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে, তখন তাইয়াম্মুম করা জায়েয।

প্রশ্ন ঃ পানি না পাওয়ার কি কি উপায় হতে পারে ?

উত্তর ঃ পানি এক মাইল দূরে হলে কিংবা কোন শত্রুর ভয়ের দরুন পানি সংগ্রহ করতে না পারলে– যেমন, বাড়ির বাইরে কুয়া রয়েছে; কিন্তু বাড়ি থেকে বের হলে শত্রু কিংবা চোর-ডাকাতেরা মেরে ফেলতে পারে অথবা কুয়ার কাছে বড় বড় বিষধর সাপ ঘোরা-ফেরা করছে বা বাঘ দাঁড়িয়ে আছে কিংবা নিজের কাছে সামান্য পানি আছে বটে; কিন্তু তা ওযূতে ব্যয় করে ফেললে তৃষ্ণায় কষ্ট হতে পারে অথবা কুয়া কাছেই রয়েছে; কিন্তু পানি তোলার মত দড়ি-বালতি উপস্থিত নেই কিংবা সবই আছে; কিন্তু লোকটি উঠে গিয়ে তা আনতে পারছে না অথচ অন্য কোন লোকও নেই– এসব অবস্থাই পানি না পাওয়ার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ঃ অসুস্থ্ হয়ে পড়ার আশঙ্কা কখন গ্রহণযোগ্য হবে ?

উত্তর ঃ যখন নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতায় প্রবল ধারণা জন্মায় কিংবা কোন বিজ্ঞ হাকীম বা চিকিৎসকের কথায় জানা যায় যে, পানি ব্যবহার করলে অসুস্থ্ হয়ে পড়বে, তখন তাইয়াম্মুম করা জায়েয।

প্রশ্ন ঃ পানি এক মাইল দূরে হওয়া বলতে কি বুঝানো হয়েছে একটু স্পষ্ট করে বলুন।

উত্তর ঃ মানুষ যখন এমন কোন জায়গায় অবস্থান করে, যেখানে পানি নেই; কিন্তু তাকে কারো বলে দেয়ার কিংবা নিজের বুদ্ধিতে এ বিষয়ে প্রবল ধারণা হয় যে, পানি এক মাইলের ভেতরে রয়েছে, তখন পানি এনে ওযূ করা জরুরী।

কিন্তু বলার মতও যদি কেউ না থাকে এবং কোন উপায়েই পানির সন্ধান পাওয়া না যায় অথবা পানির সন্ধান পেলেও তা এক মাইল কিংবা তার চেয়েও দূরে হয়, তাহলে পানি বয়ে আনা জরুরী নয়; তাইয়াম্মুম করে নেয়া জায়েয।

প্রশ্ন ঃ তাইয়াম্মুমের ফরয কয়টি ?

উত্তর ঃ তাইয়াম্মুমের ফরয তিনটি। (১) নিয়ত করা, (২) উভয় হাতের তালু মাটিতে মেরে তা মুখমণ্ডলে ফেরানো এবং (৩) উভয় হাত মাটিতে মেরে উভয় হাতের কনুই সহকারে মলা।

প্রশ্ন ঃ তাইয়াম্মুম করার পুরো নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ প্রথমে নিয়ত করবে যে, আমি নাপাকী দূর করতে এবং নামায পড়ার জন্য তাইয়াম্মুম করছি। তারপর উভয় হাতের তালু মাটির কোন বড় চাকার উপর মেরে তা ঝেড়ে নেবে এবং মাটি বেশী পরিমাণ লেগে থাকলে তা ফুঁ দিয়ে ফেলে দেবে এবং উভয় হাতকে মুখের উপর এমনভাবে ফেরাবে যাতে কোন জায়গা বাকী না থাকে। এক চুল পরিমাণ জায়গা ফাঁক পড়লেও তাইয়াম্মুম শুদ্ধ হবে না। তারপর দ্বিতীয় বার উভয় হাত মাটিতে মারবে এবং ঝেড়ে নিয়ে প্রথমে বাঁ হাতের চারটি আঙ্গুল ডান হাতের আঙ্গুলসমূহের মাথার নীচে রেখে সেখান থেকে টেনে কনুই পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এভাবে নিয়ে গেলেই ডান হাতের নীচের দিকের কাজ হয়ে গেল। তারপর বাঁ হাতের তালু ডান হাতের উপরের দিকের কনুই থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত টেনে আনবে এবং বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির ভেতরের দিকটি ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পিঠে ফেরাবে। অতঃপর এমনিভাবে ডান হাতকে বাঁ হাতের উপর ফেরাবে। তারপর উভয় হাতের আঙ্গুলের খেলাল করবে। যদি আংটি পরিহিত থাকে, তবে তা খুলে ফেলা কিংবা নাড়াচাড়া করা জরুরী। দাড়ির খেলাল করাও সুন্নত।

প্রশ্ন ঃ ওযূ ও গোসল উভয়ের জন্যই তাইয়াম্মুম জায়েয, নাকি শুধু ওযূর জন্য ?

উত্তর ঃ উভয়ের জন্যই তাইয়াম্মুম জায়েয।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ বস্তুর উপর তাইয়াম্মুম করা জায়েয ?

উত্তর ঃ পাক মাটি, বালি, পাথর, চুনা, মাটির কাঁচা বা পোড়ানো পাত্র যা তৈলাক্ত নয়, মাটির কাঁচা-পাকা ইট। মাটি, ইট, পাথর কিংবা চুনার দেয়াল এবং গিরি মাটি ও মুলতানী মাটির উপর তাইয়াম্মুম করা জায়েয।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ বস্তুর উপর তাইয়াম্মুম করা বৈধ নয় ?

উত্তর ঃ কাঠ, লোহা, সোনা, রূপা, তামা, পিতল, এলুমিনিয়াম, কাঁচ, রাং, চাচ, গম, যব ও সমস্ত খাদ্য-সামগ্রী এবং কাপড় ও ছাই প্রভৃতির উপর তাইয়াম্মুম করা জায়েয নয়। এক কথায় বলতে গেলে যেসব বস্তু-সামগ্রী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, এমন জিনিসের উপর তাইয়াম্মুম করা নাজায়েয।

প্রশ্ন : পাথর, চুনা কিংবা ইটের দেয়ালে ধূলা বালু না থাকলে তাতে তাইয়াম্মুম জায়েয হবে কিনা ?

উত্তর : আমরা যেসব বস্তু-সামগ্রীর উপর তাইয়াম্মুম জায়েয বলেছি, সে সবের উপর ধূলা-বালু থাকার কোন শর্ত নেই। পাথর, ইট কিংবা মাটির পাত্র ধোয়া হলেও তাতে তাইয়াম্মুম জায়েয।

প্রশ্ন : যেসব জিনিসের উপর তাইয়াম্মুম জায়েয নয়, সে সবের উপর যদি ধূলা-বালু পড়ে থাকে, তাহলে তাইয়াম্মুম হয়ে যাবে কিনা ?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি এমন ধূলা-বালি পড়ে থাকে যে, হাত মারলে ধূলা উড়ে কিংবা সেটির উপর হাত রেখে টানলে দাগ পড়ে যায়, তবে তাইয়াম্মুম জায়েয।

প্রশ্ন : কোরআন শরীফ পড়া, তা স্পর্শ করা, মসজিদে প্রবেশ করা, আযান দেয়া কিংবা সালামের জওয়াব দেয়ার নিয়তে যদি তাইয়াম্মুম করে থাকে, তবে সে তাইয়াম্মুম দ্বারা নামায জায়েয কিনা ?

উত্তর : জায়েয নয়।

প্রশ্ন : জানাযার নামায অথবা তেলাওয়াতের সজদার নিয়তে তাইয়াম্মুম করে থাকলে, তাতে নামায জায়েয কিনা ?

উত্তর : জায়েয।

প্রশ্ন : পানি না পাওয়ার দরুন তাইয়াম্মুম করে নামায পড়ে ফেলার পর পানি পাওয়া গেলে তখন হুকুম কি ? নামায বহাল থাকবে কিনা ?

উত্তর : নামায হয়ে গেছে, তা পুনরায় পড়তে হবে না, চাই পানি সময়ের মধ্যেই পাওয়া যাক বা সময়ের পরে।

প্রশ্ন : কি কি কারণে তাইয়াম্মুম ভঙ্গ হয় ?

উত্তর : যেসব কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়, সেসব কারণে তাইয়াম্মুমও ভেঙ্গে যায়। অবশ্য গোসলের তাইয়াম্মুম শুধু হদসে আকবরের কারণেই ভাঙ্গে। পানি না পাওয়ার কারণে গোসলের জন্য তাইয়াম্মুম করে থাকলে তা পানি পাওয়ার কারণেও ভেঙ্গে যায়। আর অন্য কোন ওযর বা উপসর্গের কারণে যেমন, রোগ-ব্যাধির কারণে তাইয়াম্মুম করে থাকলে সে উপসর্গ চলে গেলেও তাইয়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে।

প্রশ্ন : এক ওয়াক্তের নামাযের জন্য তাইয়াম্মুম করে থাকলে তাতে অন্য ওয়াক্তের নামায জায়েয হবে কিনা ?

উত্তর ঃ এক তাইয়াম্মুম দ্বারা তা না ভাঙ্গা পর্যন্ত যত ওয়াক্তের ইচ্ছা নামায পড়া যেতে পারে। তেমনিভাবে ফরয নামাযের জন্য করা তাইয়াম্মুম দ্বারা যাবতীয় ফরয ও নফল নামায, কোরআন তেলাওয়াত, জানাযার নামায এবং তেলাওয়াতের সজদাসহ সমস্ত এবাদতই জায়েয।

প্রশ্ন ঃ তাইয়াম্মুমের স্থায়ীত্বকাল কতটুকু ?

উত্তর ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত পানি না পাওয়া যায় কিংবা উপসর্গ বাকী থাকে, ততক্ষণই তাইয়াম্মুম জায়েয। এমন অবস্থায় কয়েক বছর কেটে গেলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই।

নামাযের দ্বিতীয় শর্ত–কাপড় পাক হওয়ার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কাপড় বা পোশাকের পবিত্রতার কি অর্থ ?

উত্তর ঃ জামা, পাজামা, টুপি, পাগড়ী, লুঙ্গি, আচকান প্রভৃতি যত পোশাক-আশাক নামাযীর শরীরে থাকবে, সে সবগুলোর পাক হওয়া জরুরী। অর্থাৎ, সেগুলোর যে কোনটিতে নাজাসাতে গলীজা তথা গাঢ় নাপাকীর এক সিকির বেশী পরিমাণ কিংবা নাজাসাতে খফীফা তথা হালকা নাপাকী কাপড়ের যে কোন একটির এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত না পৌঁছানো নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং নাজাসাতে গলীজা এক সিকি কিংবা তার চেয়ে কম এবং নাজাসাতে খফীফা কাপড়ের এক চতুর্থাংশের কম লাগা থাকলে নামায জায়েয হয়ে যাবে। তবে মাকরূহ হবে।

প্রশ্ন ঃ পাগড়ীর একটি প্রান্ত যদি নাপাক থাকে এবং নামাযী যদি সে প্রান্তটি আলগা রেখে অর্ধেক পাগড়ী মাথায় বেঁধে নেয়, তাহলে নামায হয়ে যাবে কিনা ?

উত্তর ঃ নামাযীর দেহের সাথে যেসব কাপড়-চোপড় এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে, তার নড়াচড়ার সাথে সাথে সেগুলোও নড়াচড়া করে তবে এমন কাপড়-চোপড় পাক হওয়া শর্ত। কাজেই এ অবস্থায় নামায হবে না। কারণ, নামাযী নড়াচড়া করলে পাগড়ীটিও অবশ্যই নড়াচড়া করবে।

নামাযের তৃতীয় শর্ত–জায়গা পাক হওয়ার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ জায়গা পাক হওয়ার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ নামাযীর উভয় পা, হাঁটু, হাত ও সজদার জায়গা পাক হওয়া জরুরী।

প্রশ্ন ঃ যে জিনিসের উপর নামায পড়া হল, তার অপর দিকে নাপাক থাকলে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ যদি কাঠের তক্তা, পাথর, বিছানো ইট কিংবা এমনি ধরনের অন্য কোন শক্ত ও মোটা জিনিসের উপর নামায পড়া হয় এবং তার সে দিকটি যাতে নামায পড়া হল পাক থাকে, তবে নামায হয়ে যাবে; অপর দিকটি নাপাক থাকলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি পাতলা কাপড়ের উপর নামায পড়া হয় এবং তার উল্টো দিকে নাপাকী থেকে থাকে, তবে নামায শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন ঃ কাপড় যদি দোপল্লা হয় আর উপরেরটি পাক এবং নীচেরটি নাপাক হয়, তবে কি হুকুম ?

উত্তর ঃ উভয় পল্লা যদি পরস্পরের সাথে সেলাই করা না হয় এবং উপরের পল্লাটি এমন মোটা হয়, যাতে নীচের নাপাকীর দুর্গন্ধ বা রং বোঝা যায় না, তাহলে নামায জায়েয হবে। আর যদি উভয় পল্লা সেলাই করা হয়, তবে তাতে নামায না পড়াই সতর্কতা।

প্রশ্ন ঃ নাপাক ভূমি, কাপড় কিংবা ফরাসের উপর পাক কাপড় বিছিয়ে নামায পড়লে তার কি হুকুম ?

উত্তর ঃ উপরের কাপড়ে যদি নীচের নাপাকীর দুর্গন্ধ বা রং প্রকাশ না পায়, তবে নামায জায়েয।

প্রশ্ন ঃ যদি নামাযের জায়গাটি পাক হয়; কিন্তু আশপাশে নাপাকী থাকে এবং নামাযের মাঝে তার দুর্গন্ধ আসতে থাকে, তাহলে নামায হবে কিনা ?

উত্তর ঃ নামায হয়ে যাবে; কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এমন জায়গায় নামায পড়া ভাল নয়।

নামাযের চতুর্থ শর্ত–সতর ঢাকার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ সতর ঢাকা বা আবৃত করার মর্ম কি ?

উত্তর ঃ পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত নিজের দেহ ঢেকে রাখা ফরয। এটি নামাযের ভেতরেও ফরয এবং বাইরেও ফরয। আর মহিলাদের জন্য হাতের তালু, পা ও মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা ফরয। মেয়েদের জন্য যদিও নামায পড়তে গিয়ে মুখ ঢাকা ফরয নয়; কিন্তু ভিন্ন পুরুষদের সামনে অনাবৃত মুখে বেপর্দা আসাটাও জায়েয নয়।

প্রশ্ন ঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে সতরের কোন অংশ খুলে গেলে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ যদি এক চতুর্থাংশ খুলে গিয়ে ৩ বার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم (সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম) বলার মত সময় পর্যন্ত খোলা থাকে, তবে নামায ভেঙ্গে যাবে। আর যদি খোলার সাথে সাথে ঢেকে ফেলে, তবে নামায শুদ্ধ হবে।

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি অন্ধকারে নগ্ন দেহে নামায পড়ে ফেলে, তবে তার কি হুকম ?

উত্তর ঃ কাপড় থাকা অবস্থায় নগ্ন দেহে নামায পড়লে তা অন্ধকারেই হোক কিংবা আলোতে– শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে সতরের এক চতুর্থাংশ খুলে ফেললে তার কি হুকুম ?

উত্তর ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে সতরের এক চতুর্থাংশ খোলার সঙ্গে সঙ্গে নামায ভেঙ্গে যাবে।

প্রশ্ন ঃ কারো কাছে কাপড় আদৌ না থাকলে সে কি করবে ?

উত্তর ঃ কোন রকম কাপড়ই যদি না থাকে, তবে গাছের ছাল-পাতা বা চট প্রভৃতি অন্য কোন কিছুর দ্বারা সতর ঢেকে নেবে। আর সতর ঢাকার মত কোন কিছুই যদি পাওয়া না যায়, তবে নগ্ন অবস্থায়ই নামায পড়ে নেবে। কিন্তু এ অবস্থায় বসে নামায পড়া এবং রুকূ-সজদা ইশারায় সম্পন্ন করা উত্তম।

নামাযের পঞ্চম শর্ত–সময়ের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ নামাযের জন্য সময় শর্ত হওয়ার কি অর্থ ?

উত্তর ঃ নামায আদায় করার জন্য যে সময় নামাযের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, ঠিক সে সময়ে পড়া শর্ত। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পড়ে নিলে তা একেবারেই আদায় হবে না এবং সময়ের পরে পড়লে তা আদায় নয়; বরং কাযা হবে।

প্রশ্ন ঃ কত ওয়াক্তের নামায ফরয ?

উত্তর ঃ দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয। এছাড়া বিত্‌রের একটি নামায ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল কাকে বলে এবং এগুলোর পার্থক্য কি কি ?

উত্তর ঃ ফরয বলা হয় এমন বিষয়কে যা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ, এর প্রামাণ্যতায় কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। এর ফরযিয়ত

তথা অপরিহার্যতার অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যায় এবং কোন ওযর ছাড়া এর বর্জনকারী ফাসেক ও আযাবের যোগ্য হয়ে পড়ে। ওয়াজিব হল এমন বিষয় যা যন্নী প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এর অস্বীকারকারী কাফের হয় না বটে কিন্তু বিনা ওযরে বর্জনকারী ফাসেক ও শাস্তিযোগ্য হয়। সুন্নত হল সেসব বিষয়, যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিজে সম্পাদন করেছেন কিংবা করতে বলেছেন। নফল সেসব কাজকে বলা হয়, যেগুলোর মহত্ব শরীঅতের মাধ্যমে প্রমাণিত। এগুলো সম্পাদন করলে সওয়াব হয়; কিন্তু ছেড়ে দিলে আযাব হয় না। একে মুস্তাহাব, মন্দুব এবং তাতাব্বু'-ও বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ ফরয কত প্রকার ?

উত্তর ঃ দু'প্রকার ঃ (১) ফরযে আইন ও (২) ফরযে কেফায়া। ফরযে আইন সে সমস্ত ফরযকে বলা হয়, যা আদায় বা সম্পাদন করা প্রত্যেকটি লোকের জন্য অপরিহার্য এবং বিনা ওযরে বর্জন করলে ফাসেক ও গোনাহ্গার হতে হয়। আর ফরযে কেফায়া হল সে সমস্ত ফরয যা দু'এক জন সম্পাদন করলে সবাই জিম্মা থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং কেউই সম্পাদন না করলে সবাই সমান গোনাহ্গার হয়।

প্রশ্ন ঃ সুন্নত কত প্রকার ?

উত্তর ঃ দু'প্রকার ঃ (১) সুন্নতে মুআক্কাদা ও (২) সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা। সুন্নতে মুআক্কাদা সে সমস্ত কাজকে বলা হয়, যেগুলো হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় বা নিয়মিত করেছেন কিংবা করতে বলেছেন এবং নিয়মিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, বিনা ওযরে কখনও বর্জিত হয়নি। এ সুন্নতসমূহ বিনা ওযরে বর্জন করা পাপ এবং বর্জনে অভ্যাস হয়ে পড়া কঠিন পাপ। আর সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা বলা হয়, সেসব কাজকে যেগুলো হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় করতেন; কিন্তু কখনও কখনও বিনা কারণে বা বিনা ওযরে ছেড়েও দিতেন। এসব সুন্নত কাজ করলে মুস্তাহাব অপেক্ষা বেশী সওয়াব হয়, আর ছেড়ে দিলে গোনাহ্ হয় না। এগুলোকে সুন্নতে যায়েদাও বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ হারাম, মাকরূহে তাহ্রীমী ও মাকরূহে তানযীহী বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ হারাম এমন কাজকে বলা হয়, যার নিষিদ্ধতা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এর সম্পাদনকারী ফাসেক ও আযাবের যোগ্য হবে। আর এর

অস্বীকারকারী হবে কাফের। মাকরূহে তাহ্‌রীমী এমন কাজকে বলা হয়, যার নিষিদ্ধতা যন্নী দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী কাফের নয়; কিন্তু এর সম্পাদনকারী গোনাহ্‌গার হবে। মাকরূহে তানযীহী এমন কাজকে বলা হয়, যা বর্জন করলে সওয়াব হয় এবং সম্পাদনে গোনাহ্‌ না হলেও এক রকম খারাবী থাকে।

প্রশ্ন ঃ মোবাহ্‌ কাকে বলে ?

উত্তর ঃ মোবাহ্‌ এমন কাজকে বলা হয়, যা করলে সওয়াব হয় না এবং না করলে গোনাহ্‌ বা আযাব হয় না।

প্রশ্ন ঃ ফজরের নামাযের সময় কখন হয় ?

উত্তর ঃ সূর্য উঠার প্রায় দেড় ঘন্টা পূর্বে পূর্ব দিকে আকাশের প্রান্তে একটি শ্বেত আভা প্রকাশিত হয়। এ আভাটি ভূমি থেকে উঠে আকাশের দিকে একটি থামের আকারে উপরের দিকে লম্বিত হয়। একে সুব্‌হে কাযেব বলা হয়। অল্পক্ষণ পরেই এ শ্বেত আভা মিলিয়ে যায় এবং তার পরে আরেকটি শ্বেত আভা প্রকাশিত হয়, যা পূর্ব দিকে ডানে-বাঁয়ে বিস্তৃত হতে থাকে। অর্থাৎ, গোটা পূর্বাকাশে ছড়িয়ে থাকে, লম্বালম্বি উঠে না। এ অবস্থাকে 'সুবহে সাদেক' বলা হয়। সুব্‌হে সাদেক প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামাযের সময় শুরু হয়ে যায় এবং সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বলবৎ থাকে। সূর্যের সামান্যতম অংশ প্রকাশ পেতেই ফজরের সময় শেষ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ফজরের মুস্তাহাব সময় কোন্‌টি ?

উত্তর ঃ দিগন্ত যখন ফর্সা হয়ে যায় এবং এতটা সময় হয়, যাতে সুন্নত অনুযায়ী ভালভাবে নামায আদায় করার পরও এতটা সময় থাকে যে, যদি কোন কারণে এ নামায সঠিক না হয়, তবে সূর্যোদয়ের পূর্বেই তা সুন্নত মোতাবেক পুনরায় পড়া যায়। এমন সময় নামায পড়া উত্তম।

প্রশ্ন ঃ যোহরের সময় কখন হয় ?

উত্তর ঃ যোহরের নামাযের সময় সূর্য ঢলার পর থেকে শুরু হয় এবং কোন জিনিসের ছায়া ঠিক দুপুর বেলার ছায়া বাদ দিয়ে তার দ্বিগুণ হয়ে গেলে তা শেষ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ যোহরের মুস্তাহাব সময় কি ?

উত্তর ঃ গরমের দিনে এতটা দেরী করে পড়া, যাতে গরমের প্রচণ্ডতা কমে যায় এবং শীতের দিনে প্রথম সময়ে অর্থাৎ, সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়া

মুস্তাহাব। কিন্তু যে কোন অবস্থায় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে যোহরের নামায এক মিস্ল অর্থাৎ, কোন জিনিসের ছায়া পূর্ব দিকে প্রায় দেড় গুণ হওয়ার মাঝামাঝি সময়ে পড়ে নেয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ আসরের নামাযের সময় কতটুকু ?

উত্তর ঃ যখন যে কোন বস্তুর ছায়া তার আসল ছায়া ছাড়া দ্বিগুণ হয়ে যায়, তখন যোহরের সময় শেষ হয়ে আসরের সময় শুরু হয়ে যায় এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী থাকে। কিন্তু সূর্য বেশী নীচে নেমে গেলে এবং রোদ দুর্বল ও হরিদ্রাভ হয়ে পড়লে নামায মাকরূহ হয়ে যায়। তার আগেই আসরের নামায পড়ে নেয়া কর্তব্য।

প্রশ্ন ঃ মাগরিবের নামাযের সময় বর্ণনা কর ?

উত্তর ঃ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মাগরিবের নামাযের সময় শুরু হয়ে যায় এবং শফক (বা আকাশে লালিমার পর শ্বেত আভা) ডুবা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

প্রশ্ন ঃ 'শফক' কাকে বলা হয় ?

উত্তর ঃ সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে যে লালিমা অব্যাহত থাকে, তাকে 'শফকে আহ্মার' বলা হয়। এ লালিমা মিশে যাবার পর এক শ্বেত আভা অব্যাহত থাকে। তাকে 'শফকে আবইয়ায' বলে। কিছুক্ষণ পর এ শ্বেত আভাও মিশে যায় এবং সমগ্র আকাশ একই রকম মনে হয়। এ শ্বেত আভা বিলীন হবার পূর্ব পর্যন্ত মাগরিবের সময় বাকী থাকে।

প্রশ্ন ঃ মাগরিবের মুস্তাহাব সময় কোন্‌টি ?

উত্তর ঃ প্রথম সময় মুস্তাহাব এবং বিনা ওযরে বিলম্বে নামায পড়া মাকরূহ।

প্রশ্ন ঃ এশার নামাযের সময় কি ?

উত্তর ঃ শ্বেত আভা (শফকে আবইয়ায) মিশে যাবার সাথে সাথে এশার সময় শুরু হয়ে যায় এবং সুব্‌হে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

প্রশ্ন ঃ এশার মুস্তাহাব সময় কোন্‌টি ?

উত্তর ঃ রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মুস্তাহাব সময়। এরপর অর্ধরাত পর্যন্ত মোবাহ এবং তারপর থেকে মাকরূহ।

প্রশ্ন ঃ বিত্‌রের নামাযের সময় কোন্‌টি ?

উত্তর ঃ এশার নামাযের সময়ই বিত্‌রের নামাযের সময়। কিন্তু এশার পূর্বে বিত্‌রের নামায জায়েয হয় না। বলতে গেলে, এশার নামাযের পরেই বিত্‌রের সময় হয়।

প্রশ্ন ঃ বিত্‌রের মুস্তাহাব সময় কোন্‌টি ?

উত্তর ঃ কারো যদি নিজের উপর এমন ভরসা থাকে যে, শেষ রাতে নিশ্চয়ই জাগতে পারব, তবে তার জন্য শেষ রাতেই বিত্‌রের নামায পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু যদি জাগার ভরসা না থাকে, তবে শোয়ার পূর্বেই বিত্‌র পড়ে নেয়া কর্তব্য।

নামাযের ষষ্ঠ শর্ত–এস্তেকবালে কেবলার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ এস্তেকবালে কেবলার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ কেবলার দিকে মুখ করাকেই এস্তেকবালে কেবলা বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ এস্তেকবালে কেবলা নামাযে শর্ত হওয়ার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ নামায পড়ার সময় নামাযীর মুখ কেবলার দিকে থাকা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের কেবলা কি ?

উত্তর ঃ মুসলমানদের কেবলা হল খানায়ে কা'বা। খানায়ে কা'বা হল কোঠাকৃতির একটি ঘর, যা সউদী আরবের মক্কা মুআয্‌যমায় অবস্থিত। খানায়ে কা'বাকে কা'বাতুল্লাহ্, বায়তুল্লাহ্ এবং বায়তুল হারামও বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ কেবলা কোন্ দিকে অবস্থিত ?

উত্তর ঃ ভারত, বাংলাদেশ, বর্মা (মায়ানমার) এবং আরো অনেক দেশের কেবলা পশ্চিম দিকে অবস্থিত। কারণ, এসব দেশ মক্কা মুআয্‌যমা থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত।

প্রশ্ন ঃ রুগ্ন ব্যক্তির মুখ যদি কেবলার দিকে না থাকে এবং তার নড়াচড়ারও সামর্থ্য না থাকে, তবে তাকে কি করতে হবে ?

উত্তর ঃ যদি অন্য কোন লোক উপস্থিত থাকে, যে রোগীকে কেবলামুখী করে দিতে পারে এবং রোগীরও খুব বেশী কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তবে তাকে কেবলামুখী করে দেবে। আর যদি অন্য কোন লোক না থাকে কিংবা রোগীর যদি খুব বেশী কষ্ট হয়, তবে যেদিকে মুখ থাকে সেদিকেই নামায পড়ে নেবে।

নামাযের সপ্তম শর্ত–নিয়তের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ নিয়ত বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ মনের ইচ্ছা করাকে নিয়ত বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ নিয়তে কোন্ বিষয়ের ইচ্ছা করতে হবে?

উত্তর ঃ নিয়তে বিশেষভাবে সে ফরয নামাযের ইচ্ছা করা জরুরী, যা সে পড়তে চায়। যেমন, ফজরের নামায পড়তে হলে ইচ্ছা করবে যে, আজকের ফজরের নামায পড়তে চাইছি। কাযা নামায হলে ইচ্ছা করবে যে, অমুক দিনের ফজর নামাযের কাযা পড়তে চাইছি। ইমামের পেছনে নামায পড়লে তার নিয়ত করা জরুরী।

প্রশ্ন ঃ নিয়ত মুখে বলা কি ?

উত্তর ঃ মুস্তাহাব। মুখে না বললে তাতে নামাযের কোন ক্ষতি নেই, বললে ভাল।

প্রশ্ন ঃ নফল নামাযের নিয়ত কিভাবে করতে হয় ?

উত্তর ঃ নফল নামাযের জন্য এতটুকু নিয়ত করাই যথেষ্ট যে, নফল নামায পড়ছি। সুন্নত ও তারাবীহ্‌র বেলায়ও এতটুকু যথেষ্ট।

আযানের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ আযান অর্থ কি ?

উত্তর ঃ আযান অর্থ হল জানিয়ে দেয়া। কিন্তু শরীঅতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট নামাযের জন্য বিশেষ শব্দাবলীর মাধ্যমে আহ্বান করাকেই আযান বলা হয়। আযানের শব্দগুলো তা'লীমুল ইসলামের প্রথম খণ্ডে লেখা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আযান ফরয নাকি সুন্নত ?

উত্তর ঃ আযান সুন্নত। কিন্তু যেহেতু আযানের দ্বারা ইস্‌লামের একটা বিশেষ মহিমা প্রকাশ পায়, সেজন্য তার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ নামাযের জন্য আযান সুন্নত ?

উত্তর ঃ পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায ও জুমুআর নামাযের জন্য আযান সুন্নত; এছাড়া অন্য কোন নামাযের জন্য সুন্নত নয়।

প্রশ্ন ঃ আযান কখন দেয়া উচিত ?

উত্তর ঃ প্রত্যেক নামাযের আযান তার সময় হলেই দেয়া উচিত। সময় হওয়ার আগে আযান দিয়ে দিলে সময় হওয়ার পর পুনরায় দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আযানের মুস্তাহাব নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ আযানে সাতটি বিষয় মুস্তাহাব। (১) কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো, (২) আযানের বাক্যগুলো থেমে থেমে বলা; তাড়াহুড়া না করা, (৩) আযান দেয়ার সময় উভয় হাতের শাহাদাত আঙ্গুল (তর্জনী) উভয় কানে স্থাপন করা, (৪) উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আযান দেয়া, (৫) উচ্চৈঃস্বরে আযান দেয়া, (৬) حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়া আলাস্‌সালাহ্) বলার সময় ডান দিকে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়া আলাল ফালাহ্) বলার সময় বাঁ দিকে মুখ ঘুরানো এবং (৭) ফজরের আযানে হাইয়া আলাল ফালাহ্-এর পর اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (আস্-সালাতু খাইরুম্ মিনান্নাউম) দু'বার বলা।

প্রশ্ন ঃ একামত কাকে বলে ?

উত্তর ঃ ফরয নামায আরম্ভ করার পূর্বে আযানের মধ্যে যেসব বাক্য বলা হয় সেগুলো উচ্চারণ করাকে একামত বলে। কিন্তু একামতের মধ্যে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়া আলাল ফালাহ্)-এর পর قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (ক্বাদ ক্বামাতিস্‌সালাহ্) দুইবার আযানের বাক্যগুলোর চেয়ে বেশী বলতে হয়।

প্রশ্ন ঃ একামত বলা কি ?

উত্তর ঃ ফরয নামাযসমূহে একামত বলাও সুন্নত। তবে ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামাযে সুন্নত নয়।

প্রশ্ন ঃ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই কি আযান ও একামত সুন্নত ?

উত্তর ঃ না; বরং শুধু পুরুষদের জন্য সুন্নত।

প্রশ্ন ঃ বিনা ওযূতে আযান ও একামত বলা কি ?

উত্তর ঃ বিনা ওযূতে আযান দেয়া জায়েয; কিন্তু এর অভ্যাস করে নেয়া দূষণীয়। আর বিনা ওযূতে একামত বলা মাকরূহ।

প্রশ্ন ঃ কখনও যদি কেউ নিজের ঘরে ফরয নামায পড়ে নেয়, তবে আযান ও একামত বলবে কিনা ?

উত্তর ঃ পাড়ার মসজিদের আযান-একামতই যথেষ্ট; কিন্তু দিয়ে নেয়া উত্তম।

প্রশ্ন ঃ মুসাফির সফরের অবস্থায় আযান-একামত বলবে কিনা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সফরের অবস্থায় যখন জনপদের বাইরে থাকবে, তখন আযান ও একামত দু'টোই বলা উচিত। কিন্তু আযান না দিয়ে শুধু একামত বললেও দোষ নেই। আর উভয়টি ছেড়ে দেয়া মাকরূহ।

প্রশ্ন : একজনে আযান দিলে এবং অন্যজনে একামত বললে জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : আযানদাতা যদি উপস্থিত না থাকে কিংবা উপস্থিত থেকেও অন্যজনের একামত বলাতে অসন্তুষ্ট না হয়, তবে জায়েয। কিন্তু সে যদি অসন্তুষ্ট হয়, তবে মাকরূহ।

প্রশ্ন : আযানের পর কতক্ষণ অপেক্ষা করে একামত বলা উচিত ?

উত্তর : মাগরিবের আযান ছাড়া অন্য সব ওয়াক্তে এ পরিমাণ অপেক্ষা করা উচিত যে, পানাহারে ব্যস্ত কিংবা পেশাব-পায়খানায় লিপ্ত লোকেরা কাজ শেষ করে নামাযে শরীক হতে পারে। আর মাগরিবের আযানের পর তিনটি আয়াত পড়ার মত সময় বিরতি দিয়ে একামত বলবে।

প্রশ্ন : আযান ও একামতের 'এজাবত' কাকে বলে এবং এর হুকুম কি ?

উত্তর : আযান ও একামতের 'এজাবত' মুস্তাহাব। আর এজাবত অর্থ হল-শ্রোতারও সে বাক্যগুলো মনে মনে বলতে থাকা যা মুআয্যিন বা মুকাব্বির বলে। তবে হাইয়া আলাস্‌সালাহ্ ও হাইয়া আলাল ফালাহ্-এর পর لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) এবং ফজরের আযানে 'আস্‌সাতলাতু খাইরুম মিনান্নাউম' শুনে صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ (সাদাকাতা ওয়া বাররতা) বলা উচিত। আর তাকবীর তথা একামতের ক্ষেত্রে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (ক্বাদকামাতিস্ সালাতু) শুনে اَقَامَهَا وَاَدَامَهَا (আক্বামাহা ওয়া আদামাহা) বলা উচিত।

প্রশ্ন : আযানের পর কি দো'আ পড়া উচিত ?

উত্তর : আযানের পর এ দো'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ-

(আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্তাম্মাহ্, ওয়াস্‌সালাতিল ক্বাইমাহ, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ্, ওয়াব্-আস্‌হু মাক্বামাম্ মাহ্মূদানিল্লাযী ওয়াআদ্‌তাহ্, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ।)

নামাযের আরকানের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ নামাযের আরকান কাকে বলে ?

উত্তর ঃ নামাযের আরকান সে সমস্ত বিষয়কে বলা হয়, যেগুলো নামাযের ভেতরে ফরয। 'আরকান' শব্দটি 'রুকন' শব্দের বহুবচন। সুতরাং রুকন অর্থ ফরয আর আরকান অর্থ ফরযসমূহ।

প্রশ্ন ঃ নামাযের ভেতরে ফরয কয়টি ?

উত্তর ঃ ছ'টি বিষয় ফরয। (১) তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলা, (২) কেয়াম করা বা দাঁড়ানো, (৩) কেরাআত অর্থাৎ, কোরআন মজীদ থেকে পাঠ করা, (৪) রুকূ করা, (৫) উভয় সজদা করা, (৬) কা'দায়ে আখীরা বা শেষ বৈঠক। অর্থাৎ, নামাযের শেষ পর্যায়ে আত্তাহিয়্যাতু পাঠের পরিমাণ সময় বসা। অবশ্য তাকবীরে তাহ্‌রীমা রুকন নয় বরং শর্ত।

প্রশ্ন ঃ তাকবীরে তাহ্‌রীমা শর্ত হলে একে পূর্বে বর্ণিত সাতটি শর্তের সাথে কেন বলা হয়নি ?

উত্তর ঃ যেহেতু তাকবীরে তাহ্‌রীমা ও নামাযের আরকানের মাঝে কোন ব্যবধান নেই এবং এরই মাধ্যমে নামায আরম্ভ হয়ে যায়, কাজেই তাকবীরে তাহ্‌রীমাকে নামাযের আরকানের সাথে বর্ণনা করাই সংগত বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

তাকবীরে তাহ্‌রীমার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ নিয়ত বাঁধার সময় যে اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলা হয়, এ তাকবীর বলার সাথে সাথেই নামায শুরু হয়ে যায় এবং যেসব বিষয় নামাযের পরিপন্থী সেসব হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই একে তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ ফরয নামাযে তাকবীরে তাহ্‌রীমা নুয়ে নুয়ে বললে তা জায়েয হবে কিনা ?

উত্তর ঃ না। কারণ, কোন ওযর বা উপসর্গ না থাকলে ফরয ও ওয়াজিব নামাযসমূহে তাহ্‌রীমার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো শর্ত।

নামাযের প্রথম রুকন– কেয়ামের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কেয়াম অর্থ কি ?

উত্তর ঃ কেয়াম বলা হয় দাঁড়ানোকে। আর দাঁড়ানো বলতে এমন সোজা হয়ে দাঁড়ানো উদ্দেশ্য, যাতে হাঁটু পর্যন্ত হাত পৌঁছাতে না পারে।

প্রশ্ন ঃ কেয়াম কি পরিমাণ এবং কোন্ নামাযে ফরয ?

উত্তর ঃ ফরয ও ওয়াজিব নামাযসমূহে এ পরিমাণ দাঁড়ানো ফরয, যাতে ফরয পরিমাণ কেরাআত পড়া যায়।

প্রশ্ন ঃ দাঁড়ানোর ক্ষমতা না থাকলে কি করতে হবে ?

উত্তর ঃ রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, শত্রুর ভয় কিংবা এমনি ধরনের কোন কঠিন উপসর্গের দরুন দাঁড়াতে না পারলে বসে বসে ফরয ও ওয়াজিব নামায পড়া জায়েয।

প্রশ্ন ঃ নফল নামাযে কিয়ামের হুকুম কি ?

উত্তর ঃ নফল নামাযে কিয়াম ফরয নয়। বিনা ওযরেও বসে বসে নফল নামায পড়া জায়েয। কিন্তু বিনা ওযরে বসে নফল পড়লে অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়।

নামাযের দ্বিতীয় রুকন–কেরাআতের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কেরাআত বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ কোরআন মজীদ পাঠ করাকে কেরাআত বলে।

প্রশ্ন ঃ নামাযে কি পরিমাণ কোরআন পাঠ করা জরুরী ?

উত্তর ঃ কমপক্ষে এক আয়াত পাঠ করা ফরয আর সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব। তাছাড়া ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকআতে, বিত্‌র, সুন্নত ও নফলের সমস্ত রাকআতে সূরা ফাতেহার পর অন্য কোন সূরা কিংবা একটি বড় আয়াত অথবা তিনটি ছোট আয়াত পড়াও ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ সমস্ত নামাযের প্রত্যেক রাকআতেই কি সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব ?

উত্তর ঃ ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত ছাড়া ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা নফল যে কোন নামাযের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ কারো যদি একটি আয়াতও জানা না থাকে, তবে সে কি করবে ?

উত্তর ঃ কেরাআতের স্থলে 'সুবহানাল্লাহ্' কিংবা 'আলহামদু লিল্লাহ্' পড়ে নেবে এবং যথাশীঘ্র কোরআন মজীদ শেখা ও ইয়াদ করা ফরয। অর্থাৎ, ফরয কেরাআত পরিমাণ ইয়াদ করা ফরয এবং ওয়াজিব পরিমাণ ইয়াদ করা ওয়াজিব। না শিখলে কঠিন গোনাহ্গার হতে হবে।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ নামাযে কোরআন মজীদ উচ্চৈঃস্বরে পড়া উচিত ?

উত্তর ঃ মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকআতে, ফজর, জুমুআ ও দু'ঈদের নামাযে এবং রমযান মাসে তারাবীহ্ ও বিত্‌রের নামাযে ইমামের উপর উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পড়া ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ কোন্ নামাযে আস্তে আস্তে কেরাআত পড়া উচিত ?

উত্তর ঃ যোহর ও আসরের নামাযে ইমাম ও মুনফারিদ উভয়কে আর বিত্‌রের নামাযে মুনফারিদকে আস্তে আস্তে কেরাআত পড়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ জোরে পড়ার মাত্রা কতটুকু ?

উত্তর ঃ জোরে পড়ার নিম্নতর মাত্রা হল এতটুকু, যেন নিজের শব্দ পার্শ্ববর্তী লোকটির কানে পৌঁছাতে পারে। আর আস্তে পড়ার নিম্নতর মাত্রা হল নিজের শব্দ নিজের কানে পৌঁছা।

প্রশ্ন ঃ যেসব নামাযে আওয়াযের সাথে কেরাআত পড়া হয় সেগুলোকে কি বলা হয় ?

উত্তর ঃ সেগুলোকে জেহরী নামায বলা হয়। কারণ, জেহের অর্থই হল জোরে পড়া।

প্রশ্ন ঃ যদি কোন লোক মুখে শব্দ না বলে শুধু কল্পনায় পড়ে যায়, তাহলে জায়েয হবে কিনা ?

উত্তর ঃ শুধু কল্পনা করে নিলে নামায হবে না; বরং মুখে পড়া জরুরী।

নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রুকন

রুকূ ও সজদার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ রুকূর নিম্নতম পরিমাণ কি ?

উত্তর ঃ রুকূর নিম্নতম পরিমাণ হল এতটুকু নোয়া, যাতে হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছায়।

প্রশ্ন ঃ রুকূর সুন্নত নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ এতটা নোয়া যাতে মাথা ও কোমর সমান থাকে, হাত পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক থাকে এবং উভয় হাতের দ্বারা হাঁটু ধরা যায়।

প্রশ্ন ঃ বার্ধক্যজনিত কারণে যদি কোমর এতটা নুয়ে পড়ে কিংবা বাঁকিয়ে রুকূর আকার হয়ে যায়, তবে রুকূ কেমন করে করবে ?

উত্তর ঃ মাথায় ইশারা করবে। অর্থাৎ, শুধু মাথা নত করলেই তার রুকূ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ সজদার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ ভূমিতে ললাট বা কপাল স্থাপন করাকে সজদা বলে।

প্রশ্ন ঃ শুধু নাক কিংবা কপালের উপর সজদা করলে সজদা আদায় হবে কিনা ?

উত্তর ঃ কোন ওযরের দরুন এমন করলে জায়েয হবে। বিনা ওযরে শুধু কপালের উপর সজদা করলে সজদা তো হয়ে যাবে কিন্তু মাকরূহ হবে। আর বিনা ওযরে শুধু নাকের উপর সজদা করলে সজদাই আদায় হবে না।

প্রশ্ন ঃ প্রত্যেক রাকাতে একটি সজদা ফরয, না দু'টিই ?

উত্তর ঃ দু'টি সজদাই ফরয।

প্রশ্ন ঃ কপাল ও নাক উভয়টিতেই যদি ক্ষত থাকে, তাহলে কি করতে হবে ?

উত্তর ঃ এমতাবস্থায় মাথার মাধ্যমে সজদার ইশারা করাই যথেষ্ট হবে।

প্রশ্ন ঃ প্রথম সজদার পর কতটা বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় সজদা করতে হবে ?

উত্তর ঃ ভাল করে বসার পর দ্বিতীয় সজদা করবে।

প্রশ্ন ঃ দুই ঈদ, জুমুআ কিংবা অন্য কোন বড় জামাআতে মানুষের অত্যধিক জনসমাগমের দরুন স্থান সংকুলান না হলে পেছনের লোক যদি সামনের লোকের পিঠে সজদা করে, তবে তা জায়েয কিনা ?

উত্তর ঃ জায়েয।

নামাযের পঞ্চম রুকন—কা'দায়ে আখীরার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কা'দায়ে আখীরা কি পরিমাণ ফরয ?

উত্তর ঃ আত্তাহিয়্যাতের শেষ বাক্য عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ) পর্যন্ত পড়ার সময় পরিমাণ বসা ফরয।

প্রশ্ন ঃ কা'দায়ে আখীরা কোন্ কোন্ নামাযে ফরয ?

উত্তর ঃ ফরয নামাযই হোক কিংবা ওয়াজিব, সুন্নতই হোক অথবা নফল সব নামাযেই কা'দায়ে আখীরা ফরয।

নামাযের ওয়াজিব বিষয়সমূহের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ নামাযের ওয়াজিব বিষয় বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ নামাযের ওয়াজিব সেসব বিষয়কে বলা হয়, নামাযে যেগুলো আদায় করা অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে কোনটি যদি ভুলক্রমে ছুটে যায়, তবে সজদায়ে সহু করে নিলে নামায শুদ্ধ হয়ে যায়। ভুলে ছুটে যাবার পর সজদায়ে সহু না করলে কিংবা কোনটি ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ওয়াজিবাতে নামায কতটি ?

উত্তর ঃ ওয়াজিবাতে নামায চৌদ্দটি। (১) ফরয নামাযসমূহের প্রথম দু'রাকআতকে কেরাআতের জন্য নির্ধারণ করা, (২) ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত ছাড়া সমস্ত নামাযের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়া, (৩) ফরয নামাযসমূহের প্রথম দু'রাকআত এবং ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল নামাযসমূহের সব রাকআতে সূরা ফাতেহার পর কোন সূরা কিংবা বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পড়া, (৪) সূরা ফাতেহা অন্য সূরার পূর্বে পড়া, (৫) কেরাআত ও রুকূতে এবং সজদা ও রাকআতসমূহের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা, (৬) কওমা করা। অর্থাৎ, রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, (৭) জলসা অর্থাৎ, দু'সজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা, (৮) তা'দীলে আরকান অর্থাৎ, রুকূ-সজদা প্রভৃতি শান্ত ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করা, (৯) কা'দায়ে ঊলা অর্থাৎ, তিন বা চার রাকআতবিশিষ্ট নামাযে দু'রাকআতের পর তাশাহহুদের পরিমাণ বসা, (১০) উভয় কা'দায় (বৈঠকে) তাশাহ্হুদ পড়া, (১১) ফজর, মাগরিব, এশা, জুমুআ, দুই ঈদ, তারাবীহ্ এবং রমযান শরীফের বিত্রে ইমাম সাহেবের আওয়াযের সাথে কেরাআত পড়া এবং যোহর ও আসরের নামাযে নীরবে কেরাআত পড়া, (১২) সালামের পর নামায থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, (১৩) বিত্রের নামাযে দো'আ কুনূতের জন্য তাকবীর বলা ও দো'আ কুনূত পড়া এবং (১৪) দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত (ছয়) তাকবীর বলা।

নামাযের সুন্নতসমূহের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ নামাযের সুন্নত বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ নামাযের যেসব বিষয় হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত কিন্তু সেগুলোর তাকীদ ফরয ও ওয়াজিবের সমান নয়, সেসব বিষয়কে সুন্নত বলা হয়। এসব বিষয়ের মধ্য থেকে কোনটি যদি ভুলবশতঃ ছুটে যায়, তাহ্লে না নামায ভেঙ্গে যায়, না সজদায়ে সহু ওয়াজিব হয়, আর না গোনাহ্ হয়। আর ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে নামায ভাঙ্গে না কিংবা সজদায়ে সহুও ওয়াজিব হয় না বটে; কিন্তু বর্জনকারী ভর্ৎসনার যোগ্য হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ নামাযে সুন্নত বিষয় কতগুলো ?

উত্তর ঃ নামাযে একুশটি বিষয় সুন্নত। (১) তাকবীরে তাহ্রীমা বলার আগে উভয় হাত কান পর্যন্ত তোলা, (২) উভয় হাতের আঙ্গুলগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা এবং কেবলামুখী রাখা, (৩) তাকবীর বলার সময় মাথা না নোয়ানো, (৪) ইমামের পক্ষে তাকবীরে তাহ্রীমা এবং এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার তাকবীরগুলো প্রয়োজন মত জোরে বলা, (৫) ডান হাতটি বাঁ হাতের উপরে নাভির নীচে বাঁধা, (৬) সানা পড়া, (৭) তাআউয অর্থাৎ, أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ * (আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম) পড়া (৮) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * (বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম) পড়া, (৯) ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়া, (১০) আমীন বলা, (১১) সানা, আঊযুবিল্লাহ্, বিস্‌মিল্লাহ্ ও আমীন এসব আস্তে বলা, (১২) সুন্নত অনুযায়ী কেরাআত পড়া, অর্থাৎ, যে নামাযে যে পরিমাণ কোরআন মজীদ পড়া সুন্নত, সে মোতাবেক পড়া, (১৩) রুকূ ও সজদায় তিন তিন বার তসবীহ পড়া, (১৪) রুকূতে মাথা ও পিঠ এক বরাবর সোজা রাখা এবং উভয় হাতের খোলা আঙ্গুল দ্বারা হাঁটুতে ধরে রাখা, (১৫) কওমাহ্র (রুকূ থেকে উঠার) সময় ইমামের সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ এবং মুক্তাদীর রাব্বানা লাকাল হামদ এবং মুনফারিদের তাসমী' ও তাহমীদ উভয়টি বলা, (১৬) সজদায় যাবার সময় প্রথমে দু'হাঁটু, অতঃপর উভয় হাত এবং তারপর কপাল মাটিতে রাখা, (১৭) কা'দাহ্ বা বৈঠকে বাঁ পা বিছিয়ে তার উপর বসা, ডান

পা'কে এমনভাবে খাড়া রাখা, যাতে তার আঙ্গুলের মাথাগুলো কেবলামুখী থাকে এবং উভয় হাত রানের উপর রাখা, (১৮) তাশাহ্হুদ পড়তে গিয়ে 'আশ্হাদুআল্লা ইলাহা' বলার সময় শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা, (১৯) শেষ বৈঠক বা কা'দা আখীরায় তাশাহ্হুদের পর দুরূদ পড়া, (২০) দুরূদ-এর পর দো'আ পড়া এবং (২১) প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাঁ দিকে সালাম ফেরানো।

নামাযের মুস্তাহাব বিষয়সমূহের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ নামাযে মুস্তাহাব বিষয় কতগুলো ?

উত্তর ঃ নামাযে পাঁচটি বিষয় মুস্তাহাব। (১) তাকবীরে তাহ্রীমা বলার সময় জামার হাতার ভেতর থেকে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত বের করা, (২) রুকূ ও সজদায় মুনফারিদের পক্ষে তিনবারের বেশী তসবীহ বলা, (৩) দাঁড়ানো অবস্থায় সজদার স্থানে, রুকূর সময় পায়ের পাতার উপর, জলসা ও বৈঠকে নিজের কোলের উপর এবং সালামের সময় নিজের কাঁধের উপর নজর রাখা, (৪) কাশি আসলে যথাসাধ্য চেপে রাখা এবং (৫) হাই এলে মুখ বন্ধ রাখা এবং খুলে গেলে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত এবং অন্যান্য অবস্থায় বাঁ হাতের পিঠ দ্বারা মুখ ঢেকে ফেলা।

নামায পড়ার পুরো নিয়ম

যখনই নামায পড়ার ইচ্ছা করবে, প্রথমে নিজের শরীর হদসে আকবার (বড় নাপাকী) ও হদসে আসগর (ছোট নাপাকী) এবং বাহ্যিক ও প্রকাশ্য নাপাকী থেকে পাক করে নেবে, পাক কাপড় পরে পাক জায়গায় কেবলামুখী হয়ে এমনভাবে দাঁড়াবে, যাতে উভয় পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল কিংবা তার কাছাকাছি পরিমাণ ফাঁক থাকে। অতঃপর যে নামায পড়বে তার নিয়ত মনে মনে করবে। যেমন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ফজরের ফরয নামায পড়ছি। মুখে বলা উত্তম। অতঃপর উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে। হাতের আঙ্গুল ও তালু কেবলামুখী রাখবে, যাতে বুড়ো আঙ্গুলগুলো কানের লতি বরাবর থাকে। আর আঙ্গুলগুলো খুলে রাখবে। এ সময় আল্লাহু আকবার বলে উভয় হাত নাভির নীচে বাঁধবে। ডান হাতের তালু বা নীচের দিক বাঁ হাতের উপরে থাকবে এবং ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে বাঁ হাতের গিরায় এমনভাবে ধরে রাখবে বাকী তিনটি আঙ্গুল যাতে কব্জির উপর থাকে এবং

সজদার জায়গায় নজর রাখবে। হাত বেঁধে আস্তে আস্তে সানা, তাআউয ও বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতেহা পড়বে। সূরা ফাতেহা পড়া শেষ হলে আস্তে 'আমীন' বলবে। তারপর কোন সূরা কিংবা একটি বড় আয়াত অথবা ছোট তিনটি আয়াত পড়বে। কিন্তু ইমামের পেছনে নামায পড়লে শুধু সানা পড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেব; আউযুবিল্লাহ, বিস্‌মিল্লাহ, সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা কিছুই পড়বে না। কেরাআত পরিষ্কারভাবে শুদ্ধ করে পড়বে, তাড়াহুড়ো করবে না। তারপর আল্লাহু আকবার বলে রুকূতে যাবে। আঙ্গুলগুলো খুলে তার দ্বারা হাঁটু ধরে রাখবে। রুকূতে পিঠকে এমন সোজা করে রাখবে, যাতে তাতে পানির পাত্র রেখে দিলে যথাযথ রাখা থাকে। মাথা পিঠের সমান রাখবে; উঁচু বা নীচু করবে না। হাত দু'টো পাশ থেকে আলাদা রাখবে। হাঁটুর নীচের অংশ সোজা রাখবে। তারপর রুকূর তসবীহ্ তিনবার অথবা পাঁচবার পড়বে। তসবীহ্ শেষ করে তাসমী' বলতে বলতে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে এবং তাহ্‌মীদও পড়ে নেবে। (ইমাম হলে শুধু তাসমী', মুক্তাদী হলে শুধু তাহ্‌মীদ পড়বে এবং মুনফারিদ হলে তাসমী-তাহ্‌মীদ দু'টোই পড়বে।)

অতঃপর তাকবীর বলতে বলতে সজদায় চলে যাবে। সজদায় প্রথমে উভয় হাঁটু, তারপর উভয় হাত, তারপর নাক এবং তারপর কপাল রাখবে। মুখমণ্ডল উভয় হাতের মাঝখানে এবং বুড়ো আঙ্গুল কান বরাবর থাকবে। হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে, যাতে সবগুলোর মাথা কেবলার দিকে থাকে। উভয় কনুই পাশ থেকে এবং পেট রান থেকে আলাদা থাকবে। কনুই মাটিতে বিছিয়ে দেবে না। সজদায় গিয়ে তিনবার অথবা পাঁচবার সজদার তসবীহ্ পড়বে। তারপর প্রথমে কপাল তারপর নাক তারপর হাত তুলে তাকবীর বলতে বলতে সোজা উঠে বসে যাবে। তারপর আবার তাকবীর বলে দ্বিতীয় সজদা করবে। আবার তাকবীর বলতে বলতে উঠবে এবং উঠার সময় যথাক্রমে কপাল, নাক, হাত ও হাঁটু উঠিয়ে পায়ের পাঞ্জার উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দাঁড়ানোর পর পুনরায় হাত বেঁধে যথাক্রমে বিস্‌মিল্লাহ্, সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা পড়বে। ইমামের পেছনে থাকলে কিছুই পড়বে না, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

অতঃপর একই নিয়মে রুকূ, কওমা, সজদা, বসা ও দ্বিতীয় সজদা করবে। এ সজদা থেকে উঠে বাঁ পা বিছিয়ে তার উপর বসে যাবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে, উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথা যেন কেবলামুখী থাকে। অতঃপর উভয় হাত রানের উপর রেখে আত্তাহিয়্যাত পড়বে। আত্তাহিয়্যাত পড়তে গিয়ে যখন আশ্-হাদু আল্‌লা ইলাহা-এ পৌঁছবে, তখন ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও

মধ্যমার দ্বারা বলয় বানিয়ে অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি বন্ধ করে নেবে এবং শাহাদত আঙ্গুল তথা তর্জনী উঠিয়ে উপরের দিকে ইশারা করবে। ইশারা করতে গিয়ে 'লা ইলাহা' বলার সময় আঙ্গুল উঠাবে আর 'ইল্লাল্লাহ্' বলার সময় নামিয়ে নেবে এবং শেষ পর্যন্ত এভাবে বলয় বেঁধে রাখবে। তাশাহ্হুদ শেষ করে যদি দু'রাকআতবিশিষ্ট নামায হয়, তবে দুরূদ পড়বে অতঃপর দো'আ পড়বে। তারপর প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাঁ দিকে সালাম ফেরাবে। ডান দিকে সালাম ফেরাবার সময় ডান দিকে মুখ ঘুরাবে এবং বাঁ দিকে সালাম ফেরাবার সময় বাঁ দিকে মুখ ঘুরাবে। ডান দিকের সালামে ডান দিকের ফেরেশতা ও নামাযীদের নিয়ত করবে, আর বাঁ দিকের সালামে বাঁ দিকের ফেরেশতা ও নামাযীদের নিয়ত করবে। আর যে দিকে ইমাম থাকবে, সেদিকের সালামে ইমামেরও নিয়ত করবে। অপরপক্ষে ইমাম উভয় সালামে মুক্তাদীদের নিয়ত করবেন। বস্তুতঃ তিন কিংবা চার রাকআতবিশিষ্ট নামায হলে দ্বিতীয় রাকআতে তাশাহ্হুদের পর দুরূদ পড়বে না; বরং তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত যদি ফরয নামায হয় তবে যথাবিধি পূর্ণ করে সালাম ফেরাবে। সালামের পর পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

এবং

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

এছাড়া নিম্নের দো'আটিও সুন্নত

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ–

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

তা'লীমুল ইসলাম

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পর্ব

ঈমানের শিক্ষা বা ইসলামী আকায়েদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তওহীদ

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ শব্দটির অর্থ কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ সে সত্তা বা যাতের নাম যিনি ওয়াজিবুল ওজূদ (যাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য) এবং সমস্ত সিফাতে কামালিয়্যাহ (পরাকাষ্ঠা সম্পন্ন গুণাবলী) তাঁর মাঝে বিদ্যমান।

প্রশ্ন ঃ ওয়াজিবুল ওজূদ অর্থ কি ?

উত্তর ঃ ওয়াজিবুল ওজূদ এমন সত্তাকে বলা হয় কিংবা এমন অস্তিত্বশীল সত্তাকে বলা হয়, যাঁর অস্তিত্ব (বিদ্যমান হওয়া) ওয়াজিব বা অপরিহার্য এবং তাঁর না থাকা অসম্ভব।

যিনি ওয়াজিবুল ওজূদ হবেন, তিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তাঁর আদিও নাই, অন্তও থাকবে না। কখনও তাঁর নাস্তি (না থাকা) হবে না। তিনি নিজে থেকেই অস্তিত্বশীল। কারণ, যে বস্তু, বিষয় বা সত্তা অন্যের সৃষ্টির দরুন অস্তিত্ব লাভ করে, তা ওয়াজিবুল ওজূদ হতে পারে না। সুতরাং ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াজিবুল ওজূদ। তাঁকে ছাড়া বিশ্বের কোন কিছুই ওয়াজিবুল ওজূদ নয়।

প্রশ্ন ঃ সিফাতে কামালিয়্যাহ্‌র অর্থ কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু ওয়াজিবুল ওজূদ আর ওয়াজিবুল ওজূদের নিজের সত্তায় পরিপূর্ণ হওয়া অপরিহার্য। তাই সে সত্তাগত পূর্ণতার জন্য যেসব গুণাবলী থাকা অপরিহার্য সেসব তাঁর জন্য প্রমাণিত। সেসব গুণাবলীকেই 'সিফাতে কামালিয়্যাহ' বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ যে বস্তু বা বিষয় চিরকাল থেকেই আছে এবং চিরকাল থাকবে, তাকে কি বলা হয় ?

উত্তর ঃ এমন বস্তু, বিষয় বা সত্তাকে 'কাদীম' (অনাদি-অনন্ত) বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কি কি জিনিস কাদীম রয়েছে ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর সমস্ত গুণাবলীই কাদীম। সেগুলো ছাড়া অন্য কোন কিছুই কাদীম বা অনাদি-অনন্ত নয়।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া যখন অন্য কোন কিছু চিরকাল থেকে বিদ্যমান ছিল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমীন ও অন্যান্য বস্তু সামগ্রী কেমন করে বানালেন ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত বিশ্বকে নিজের হুকুম ও কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী ও আসমান-যমীন সৃষ্টি করার জন্য তাঁর কোন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। কারণ, জগৎ সৃষ্টি করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলাও যদি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী হতেন, তবে তিনি ওয়াজিবুল ওজূদ হতে পারতেন না।

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াজিবুল ওজূদ আর ওয়াজিবুল ওজূদ তাঁর কোন কাজের জন্য অন্য কোন লোকের কিংবা বস্তু-সামগ্রীর মুখাপেক্ষী হন না।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সিফাতে কামালিয়্যাহ্ (শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলী) কি কি ?

উত্তর ঃ (১) একত্ব, (২) অনাদি-অনন্ত হওয়া বা ওয়াজিবুল ওজূদ হওয়া, (৩) চিরজীবী হওয়া, (৪) কুদরত বা ক্ষমতা ও শক্তি, (৫) জ্ঞান, (৬) ইচ্ছা, (৭) শ্রবণ, (৮) দর্শন, (৯) কথা বলা, (১০) সৃষ্টি করা, (১১) উদ্ভাবন করা প্রভৃতি।

প্রশ্ন ঃ একত্ব বা ওয়াহ্দাত-এর অর্থ কি ?

উত্তর ঃ ওয়াহ্দাত বা একত্ব অর্থ এক হওয়া। এটি আল্লাহ্ তা'আলারই গুণ যে, তিনি নিজের সত্তা বা অস্তিত্বের দিক দিয়েও এক এবং গুণাবলীর দিক

দিয়েও অনন্য। আর তওহীদ অর্থ হল আল্লাহ্‌র এক হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা ও স্বীকার করা।

প্রশ্ন ঃ ওয়াজিবুল ওজূদ হওয়া বা কাদীম হওয়ার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ কাদীম হওয়ার অর্থ হল সদা বিদ্যমান থাকা। আর ওয়াজিবুল ওজূদ অর্থ পূর্বেই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ অনাদি ও অনন্ত অর্থ কি ?

উত্তর ঃ যে জিনিসের শুরু বা আরম্ভ নেই অর্থাৎ, চিরকাল থেকে বিদ্যমান, তাকে অনাদি বা আযলী বলে। আর যার কোন অন্ত নেই চিরকাল থাকবে, তাকে আবদী বলে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আযলী (অনাদি)-ও এবং আবদী (অনন্ত)-ও। কাদীম হওয়া অর্থও তাই।

প্রশ্ন ঃ হায়াত অর্থ কি ?

উত্তর ঃ হায়াত অর্থ হল জীবন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা জীবিত। তাঁর জন্য জীবন গুণটি সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন ঃ সিফতে কুদরত অর্থ কি ?

উত্তর ঃ কুদরত অর্থ হল শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমতা। অর্থাৎ, বিশ্বকে সৃষ্টি করতে, তা টিকিয়ে রাখতে, ধ্বংস করে দিতে এবং পুনরায় সৃষ্টি করতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম।

প্রশ্ন ঃ সিফতে এলম কাকে বলে ?

উত্তর ঃ এলম অর্থ জানা। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত (জ্ঞানসম্পন্ন) ছোট-বড় কোন বিষয়ই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। প্রতিটি বিন্দু-বিসর্গ তিনি জানেন। প্রত্যেক বস্তুকে তার অস্তিত্বের পূর্বে এবং তার নাস্তির পরেও জানেন। অন্ধকার রাতের কালো চলন্ত পিঁপড়ের পায়ের নড়াচড়া পর্যন্ত তিনি ভালরূপে জানেন এবং দেখেন। মানুষের অন্তরে যেসব ধারণার উদয় হয়, তা-ও আল্লাহ্‌র জ্ঞানে পুরোপুরি স্পষ্ট। এলমে গায়েব আল্লাহ্‌র বিশেষ গুণ।

প্রশ্ন ঃ এরাদা অর্থ কি ?

উত্তর ঃ এরাদা অর্থ হল নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা যে বিষয়ের ইচ্ছা করেন, তা নিজ এখতিয়ার ও অধিকারে সৃষ্টি করে ফেলেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা নিজ এখতিয়ারে নিশ্চিহ্ন করে দেন। পৃথিবীর সমস্ত বিষয় তাঁর একচ্ছত্র অধিকার ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়। বিশ্বের কোন কিছুই তাঁর ইচ্ছা ও এখতিয়ারের বাইরে নয়। কোন কাজ করা না করার ব্যাপারে তিনি বাধ্য নন।

প্রশ্ন : শ্রবণ ও দর্শন গুণ বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর : শ্রবণ অর্থ শোনা, আর দর্শন অর্থ দেখা। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন। কিন্তু সৃষ্ট প্রাণীর মত তাঁর কোন কান নেই এবং সৃষ্ট প্রাণীর মত তাঁর চোখও নেই; তাঁর চোখ ও কানের কোন আকার-আকৃতিও নেই; কিন্তু যে কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় তিনি শোনেন এবং যে কোন ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বস্তু তিনি দেখেন। তাঁর শুনতে কিংবা দেখতে কাছে বা দূরে কিংবা আলো-আঁধারের কোন পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন : সিফতে কালাম অর্থ কি ?

উত্তর : কালাম অর্থ হল বাণী, কথা বলা। আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এ গুণটিও প্রমাণিত সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু সেজন্য তাঁর মানুষের জিহ্বার মত জিহ্বা নেই।

প্রশ্ন : আল্লাহ্ তা'আলার যদি জিহ্বাই না থাকবে, তবে তিনি কথা বলেন কেমন করে ?

উত্তর : মানুষ জিহ্বা ছাড়া কথা বলতে পারে না। কারণ, সৃষ্টি তাদের সমস্ত কাজকর্মে উপায়-উপকরণের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যেমন নিজের কোন কাজের ব্যাপারেই অন্য কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, তেমনি কথা বলার জন্য তিনি জিহ্বার মুখাপেক্ষী নন। তিনিও যদি কথা বলার জন্য জিহ্বার মুখাপেক্ষী হন, তাহলে তিনি আল্লাহ্ কিংবা ওয়াজিবুল ওজূদ হতেই পারেন না।

প্রশ্ন : সিফতে খাল্‌ক ও তাকবীন অর্থ কি ?

উত্তর : খাল্‌ক অর্থ সৃষ্টি করা আর তাকবীন অর্থ অস্তিত্ব দান। আল্লাহ্ তা'আলার এগুণও প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। তিনিই সমস্ত বিশ্বের খালেক বা সৃষ্টিকর্তা ও মুকাব্বিন বা অস্তিত্বদাতা।

প্রশ্ন : এসব গুণ ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার কি আরও গুণাবলী রয়েছে ?

উত্তর : হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলার আরও বহু গুণাবলী রয়েছে। যেমন, মৃত্যুদান, জীবনদান, রিযিক বা জীবিকাদান, ইয্‌যত বা সম্মান দান, যিল্লত বা অসম্মানিত করা প্রভৃতি। আর আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় গুণাবলীই আযলী ও আবদী (অনাদি ও অনন্ত) ও কাদীম (চিরস্থায়ী)। এতে কোন কমবেশী বা রদবদল হতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবসমূহ

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আকায়েদে বলা হয়েছে যে, কোরআন মজীদ তেইশ বছরে অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ কোরআন মজীদেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন– شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ, "রমযানের মাস হল সে মাস, যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" (সূরা বাকারা, রুকূ' ২৩) এতে বুঝা যায়, কোরআন মজীদ রমযান মাসেই নাযিল হয়েছে। তাছাড়া কোরআন মজীদেরই অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ অর্থাৎ, "একে (কোরআনকে) আমি শবে কদরে অবতীর্ণ করেছি।" এতে বুঝা যায়, কোরআন মজীদ শবে কদরেই নাযিল হয়েছে। এ তিনটি কথাই পরস্পর বিরোধী, কাজেই প্রশ্ন হল, এর কোন্‌টি বিশুদ্ধ ও সঠিক ?

উত্তর ঃ তিনটিই বিশুদ্ধ ও সঠিক। কথা হল এই যে, কোরআন মজীদ দু'ভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। একটি হল পুরো কোরআন মজীদ একবারে লওহে মাহফূয থেকে পৃথিবীর আকাশে (প্রথম আসমানে) অবতীর্ণ করা হয়। আর দ্বিতীয়টি হল এই যে, পৃথিবীর বুকে সময়ে সময়ে প্রয়োজন মোতাবেক অল্প অল্প করে তা অবতীর্ণ হয়। সুতরাং কোরআন মজীদের উল্লিখিত দু'টি আয়াতে প্রথম প্রকার অবতরণের কথা বলা হয়েছে যে, তা লওহে মাহ্-ফূয (আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার পর) থেকে পৃথিবীর আকাশে রমযান মাসের এক রাতে (শবে কদরে) অবতীর্ণ হয় এবং তেইশ বছরে অবতীর্ণ হওয়ার দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার অবতরণ উদ্দেশ্য। যা পৃথিবীর আকাশ থেকে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তেইশ বছরে অবতীর্ণ হয়। কাজেই তিনটি বক্তব্য পরস্পর বিরোধী নয়; বরং তিনটিই যথার্থ ও সঠিক।

প্রশ্ন ঃ কোরআন মজীদের অবতরণ সর্বপ্রথম কোন জায়গায় শুরু হয় ?

উত্তর ঃ মক্কা মুআয্‌যমায় একটি পাহাড় আছে। তার নাম হেরা। তাতে একটি গুহা ছিল। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে গুহায় আল্লাহ্ তা'আলার উপাসনার উদ্দেশ্যে তশরীফ নিয়ে যেতেন এবং কয়েক দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন। যখন খাবার শেষ হয়ে যেত, তখন বাড়ী এসে (খাবার দাবার নিয়ে) আবারও কয়েক দিনের জন্য চলে যেতেন। সেখানে তিনি একা একা আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত-উপাসনা

করতে থাকতেন। হেরা নামক সে গুহায়ই হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআন অবতরণ শুরু হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ কোরআন মজীদের অবতরণ কেমন করে শুরু হয়?

উত্তর ঃ একদিন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে গুহায়ই অবস্থান করছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলেন, اِقْرَأْ (ইকরা)। এ শব্দটি সূরা আলাকের প্রথম বাক্য। এর অর্থ হল 'পড়'। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি পড়তে পারি না। এভাবে তিনবার কথোপকথনের পর হযরত জিবরাঈল নিম্নের আয়াতগুলো পড়লেন–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ۝ (علق)

হযরত জিবরাঈলের কাছে শুনে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পড়ে ফেললেন। এ আয়াতগুলোই কোরআন মজীদের সর্বপ্রথম আয়াত, যা মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়।

প্রশ্ন ঃ কোরআন মজীদের অবতরণ যদি সূরা আলাকের প্রাথমিক এ আয়াত-গুলোর দ্বারা হয়ে থাকে, তবে কি কোরআন মজীদ বর্তমানে যে বিন্যাসে রয়েছে, সে বিন্যাসে অবতীর্ণ হয়নি?

উত্তর ঃ না। বর্তমান বিন্যাস অবতরণের বিন্যাস নয়। কোরআন মজীদের অবতরণ তো প্রয়োজন ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হত; কিন্তু যখনই কোন সূরা নাযিল হত, তখন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিতেন যে, এ সূরাটি অমুক সূরার পরে এবং অমুক সূরার পূর্বে লিখে রাখ। আর যখনই কোন একটি আয়াত কিংবা একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হত, তখন মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, এ আয়াতটি কিংবা আয়াতগুলো অমুক সূরার অমুক আয়াতের পরে এবং অমুক আয়াতের পূর্বে লিখে নাও। সুতরাং যদিও কোরআন মজীদ প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিভিন্ন অবস্থায় বর্তমান বিন্যাসের খেলাফ অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু বর্তমান এ বিন্যাসও হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও কথা অনুযায়ী করা হয়।

প্রশ্ন ঃ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিন্যাসে কোরআন মজীদ লিখিয়েছিলেন এবং তিনি নিজে যে তরতীব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা কি তাঁরই মতে ছিল, নাকি আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম অনুযায়ী তিনি বলে দিতেন ?

উত্তর ঃ সূরাসমূহের সংখ্যা, সেগুলোর শুরু ও সমাপ্তি, প্রত্যেক সূরার আয়াত সংখ্যা, প্রত্যেক আয়াতের শুরু ও শেষ এবং তেমনিভাবে সমগ্র কোরআন মজীদের বিন্যাস আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) অবহিত হন এবং তিনি হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেন। আর হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি।

প্রশ্ন ঃ কোরআন মজীদ যে অবতীর্ণ হয়েছে, তা চৌদ্দশ বছরেরও বেশী হয়ে গেছে। কাজেই এর কি প্রমাণ থাকতে পারে যে, আমাদের কাছে যে কোরআন মজীদ রয়েছে, তা সেই কোরআন মজীদ, যা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল।

উত্তর ঃ এ কোরআন মজীদই যে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ আসল ও আদি কোরআন মজীদ তার বহুবিধ প্রমাণ রয়েছে। আমরা এখানে কয়েকটি সহজ প্রমাণ বর্ণনা করছি।

প্রথম দলীল বা প্রমাণ ঃ কোরআন মজীদের 'মুতাওয়াতির হওয়া'। অর্থাৎ, একাধারে ধারাবাহিকভাবে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসতে থাকা। যে জিনিস তাওয়াতুর বা ধারাবাহিকতার সাথে প্রমাণিত হয়ে যায়, তার প্রমাণ নিশ্চিত ও অকাট্য বলে বিবেচিত হয়; তাতে কোন রকম সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ 'মুতাওয়াতি'র বা 'তাওয়াতুর' অর্থ কি ?

উত্তর ঃ যে বিষয়ের বর্ণনাকারী এত অধিক সংখ্যক হয় যে, তাদের সবার পক্ষে মিথ্যা বলা যুক্তির কাছে অসম্ভব, সে বিষয়কে 'মুতাওয়াতির' বলা হয়। আর বিষয়টির এভাবে বর্ণিত হয়ে চলে আসাকে 'তাওয়াতুর' বলে।

সুতরাং কোরআন মজীদকে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল থেকে এত অধিক পরিমাণ লোক বর্ণনা করে এবং পাঠ ও অধ্যয়ন করে আসছে যে, সাধারণ বুদ্ধির কোন লোকও একথা বিশ্বাস করতে পারে না যে, এত বিপুল সংখ্যক লোক সবাই মিথ্যা বলবে।

দ্বিতীয় দলীল ঃ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ; বরং কোটি কোটি মুসলমান কোরআন মজীদ হেফয করে চলে আসছেন এবং আজও পৃথিবীতে মুসলমানদের অসংখ্য শিশু কিশোর, যুবক-বুড়ো রয়েছেন, যাদের বুকে কোরআন মজীদ সংরক্ষিত।

আর যে গ্রন্থের অবতরণকাল থেকে আজ পর্যন্ত এত হাফেয বিদ্যমান এবং তারা নিজের বুকে তার সংরক্ষণ করেছেন, তার সংরক্ষিত থাকা এবং এর আসল ও নির্ভেজাল হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ হতে পারে!

তৃতীয় দলীল ঃ স্বয়ং কোরআন মজীদে আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত এরশাদ করেছেন ঃ (حجر : ع-١) * إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ, "অবশ্যই আমি কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার হেফাযতকারী।" (সূরা হিজর ঃ রুকূ ১)

সুতরাং যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদের হেফাযত নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছেন এবং তার হেফাযতের অঙ্গীকার করেছেন, তখন একান্তভাবেই প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এ কোরআনই হুবহু সে কোরআন, যা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ, এর হেফাযতের ওয়াদা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা করেছিলেন। কাজেই তা আজও মাহফূয বা সংরক্ষিত রয়েছে এবং ইন্‌শাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

চতুর্থ দলীল ঃ কোরআন মজীদ নিজের অবতরণকালে যে দাবী করেছিল যে, এর মত কোন কালাম বা বাণী কোন লোকই তৈরী করতে পারবে না, সে দাবী আজও পর্যন্ত এ কোরআন মজীদ সম্পর্কে সঠিক রয়েছে। কারণ, যে কোরআন মজীদখানি আজও অবস্থিত, তার অনুরূপ না কেউ তৈরী করতে পেরেছে, না কেউ এমন দাবী করেছে, না তৈরী করতে পারে, না পারবে।

সুতরাং এটাও প্রকাশ্য প্রমাণ যে, এই কোরআনই সেই মূল কোরআন, যা হুযূরে আকরাম (দঃ)-এর প্রতি নাযিল হয়েছিল।

রেসালাত

প্রশ্ন ঃ কোরআন মজীদে আছে ঃ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ * (فاطر : ع-٣) "অর্থাৎ, কোন জাতি-সম্প্রদায়ই এমন নেই, যাদের মাঝে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আসেননি।" (সূরা ফাত্বির, রুকূ ৩) অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (رعد ع ١) "অর্থাৎ, প্রত্যেক জাতি সম্প্রদায়ের জন্যই হেদায়তকারী (পাঠানো হয়) থাকেন।" (সূরা রা'দ, রুকূ-১)

এসব আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতি-সম্প্রদায়ের মাঝেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন নবী বা পয়গম্বর পাঠানো হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে কি উপমহাদেশেও (পাক-ভারত-বাংলাদেশে) কোন নবী এসেছিলেন ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এ আয়াতগুলোর দ্বারা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক জাতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কোন হেদায়তকারী পাঠিয়েছেন এবং এ কারণে হয়তবা এ উপমহাদেশেও (পাক-ভারত-বাংলাদেশ) কোন নবী এসে থাকবেন।

প্রশ্ন ঃ একথা কি বলা যেতে পারে যে, হিন্দুদের অবতার শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রমুখ আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন ?

উত্তর ঃ একথা বলা যায় না। কারণ, নবুওত একটি বিশেষ পদমর্যাদা, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর মনোনিত বিশেষ বান্দাগণকে দান করা হত। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত শরীঅতের মাধ্যমে একথা জানা না যাবে যে, এ বিশেষ পদমর্যাদাটি আল্লাহ্ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে দান করেছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাও বলতে পারি না যে, তারা আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। যদি আমরা শরীঅতসম্মত সঠিক প্রমাণ ছাড়া শুধু নিজের মতে কোন লোককে নবী মনে করে নেই এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে নবী না হয়ে থাকেন, তাহলে এ ভুল বিশ্বাসের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে জওয়াবদেহ্ হব।

মনে করা যেতে পারে যে, কেউ যদি কেবল নিজের ধারণায় কোন লোককে বাদশাহ্‌র প্রতিনিধি বা গভর্নর জেনারেল মনে করে আর সে লোক আসলেই গভর্নর না হয়, তবে সরকারের কাছে সে অপরাধী বা দোষী সাব্যস্ত হবে। কারণ, বাদশাহ্ যাকে গভর্নর নিযুক্ত করেননি, এমন একজন লোককে গভর্নর জেনারেল মনে করে সে বাদশাহ্‌র সাথে একটি ভুল বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করল (যা অন্যায়)।

সুতরাং বিগত লোকদের মধ্যে আমরা বিশেষ করে সেসব বুযুর্গকেই নবী বলতে পারি, যাঁদের নবুওত শরীঅতের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে কিংবা কোরআন-হাদীসে তাঁদেরকে নবী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকবে।

হিন্দু কিংবা অন্যান্য জাতি-সম্প্রদায়ের দেবতা অবতারদের সম্পর্কে বড়জোর আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, যদি তাদের কর্ম ও আকীদা-বিশ্বাস সঠিক হয়ে থাকে এবং তাদের শিক্ষা আসমানী শিক্ষার পরিপন্থী না হয়ে থাকে কিংবা তারা

যদি মানবজাতির হেদায়ত ও পথপ্রদর্শনের কাজ করে থাকেন, তবে হয়তবা তারা নবী হয়ে থাকবেন। কিন্তু একথা বলা যে, তারা নিশ্চিতই নবী ছিলেন, একান্তই দলীলবিহীন উক্তি বা অনুমানের শর ছাড়া অন্য কিছু নয়।

প্রশ্ন ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি বিশ্বাস পোষণ করতে হবে ?

উত্তর ঃ (১) তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা, একজন মানুষ এবং আল্লাহ্র রাসূল ছিলেন, (২) আল্লাহ্ তা'আলার পর তিনি সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা উত্তম, (৩) তিনি যাবতীয় গোনাহ্ থেকে মা'সূম ছিলেন, (৪) তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন নাযিল করেছেন, (৫) মে'রাজের রাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আকাশে আমন্ত্রিত করেন এবং জান্নাত-দোযখ প্রভৃতির ভ্রমণ করান, (৬) তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে বহু মু'জেযা প্রদর্শন করেন, (৭) তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অনেক বেশী এবাদত-বন্দেগী করতেন, (৮) তাঁর চরিত্র ও অভ্যাস অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের ছিল, (৯) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বহুবিধ অতীত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান দান করেছিলেন। সেগুলো তিনি তাঁর উম্মতকে অবহিত করেছেন, (১০) তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক জ্ঞান দান করেছিলেন; কিন্তু তিনি 'আলেমুল গায়েব' ছিলেন না। কারণ, আলেমুল গায়েব হওয়া একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার শান এবং তাঁরই বিশেষ গুণ। (১১) তিনি সর্বশেষ নবী ছিলেন, তাঁর পরে কোন নূতন নবী হবেন না। অবশ্য হযরত ঈসা (আঃ) যিনি পূর্বকালের একজন নবী, তিনি আকাশ থেকে নেমে আসবেন এবং ইসলামী শরীঅতের অনুসরণ করবেন। (১২) তিনি মানুষ ও জিন সবারই নবী, (১৩) তিনি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিতে গোনাহ্-গারদের জন্য সুফারিশ করবেন। সে জন্যই হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'শফীউল মুয্নিবীন' বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শাফা'আত বা সুফারিশ কবুলও করবেন। (১৪) তিনি যেসব বিষয়ের হুকুম করেছেন, সেগুলোর উপর আমল করা, যেসব বিষয় নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকা এবং যেসব ঘটনা সম্পর্কে তিনি সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলোকে ঠিক তেমনিভাবে মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা উম্মতের উপর জরুরী। (১৫) তাঁর প্রতি (সর্বাধিক) ভালবাসা পোষণ করা এবং তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা প্রত্যেক উম্মতের দায়িত্ব। কিন্তু সম্মান

বলতে সে সম্মানকেই বোঝাবে যা শরীঅত নির্ধারিত নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে। শরীঅতের পরিপন্থী বিষয়কে সম্মান কিংবা ভালবাসা মনে করা বোকামি।

প্রশ্ন ঃ মা'সূম বা নিষ্পাপ বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ মা'সূম অর্থ হল এই যে, কোন সগীরা (ছোট) কিংবা কবীরা (বড়) গোনাহ্ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সংঘটিত হয়নি। সমস্ত নবী-রাসূলই পাপ থেকে মা'সূম ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মে'রাজ কি সশরীরে হয়েছিল, নাকি স্বপ্নযোগে ?

উত্তর ঃ হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে মে'রাজে গমন করেছিলেন। অতএব, তাঁর মে'রাজ দৈহিক ছিল। এই সশরীরে মে'রাজ ছাড়াও অবশ্য কয়েকবার তাঁর স্বপ্নযোগে মে'রাজ হয়েছিল। সেগুলোকে মানামী বা নিদ্রাগত মে'রাজ বলা হয়। কারণ, 'মানাম' অর্থ স্বপ্ন। তবে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তেমনিভাবে সমস্ত আম্বিয়া (আঃ)-এর স্বপ্নই সত্য হত। তাতে ভুল-ভ্রান্তির কোন সন্দেহ্ হতে পারে না। সুতরাং হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের একটি মে'রাজ ছিল জিস্মানী বা দৈহিক আর চার কিংবা পাঁচটি মে'রাজ ছিল মানামী বা স্বাপ্নিক।

প্রশ্ন ঃ শাফা'আত কাকে বলা হয় ?

উত্তর ঃ শাফা'আত বলা হয় সুফারিশকে (বা কারো জন্য কোন বিষয় সম্পর্কে অন্য কারো কাছে কোন অনুরোধ করাকে)। কিয়ামতের দিনে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোনাহ্গার বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সুফারিশ করবেন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু তথাপি আল্লাহ্ তা'আলার জালাল (মহাপরাক্রম) ও জাবারূত (প্রচণ্ড প্রতাপ)-এর সম্মানে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শাফা'আতের অনুমতি প্রার্থনা করবেন। অতঃপর যখন অনুমতি পাবেন, তখন তিনি শাফা'আত করবেন।

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্যান্য নবী-রাসূল, আউলিয়া শহীদগণও সুফারিশ করবেন; কিন্তু বিনা অনুমতিতে কেউই সুফারিশ করতে পারবেন না।

প্রশ্ন ঃ কোন্ ধরনের গোনাহ্ ক্ষমার জন্য শাফা'আত করা হবে ?

উত্তর ঃ কুফরী ও শিরক ছাড়া অন্যান্য সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমার জন্যই শাফা'আত হতে পারে। কবীরা গোনাহ্গারই শাফা'আতের বেশী মুখাপেক্ষী হবে। কারণ, সগীরা গোনাহ্সমূহ তো দুনিয়াতেই এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে মাফ হতে থাকে।

ঈমান ও আ'মালে সালেহার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ ঈমান কাকে বলে ?

উত্তর ঃ ঈমান বলা হয় ঃ (১) আল্লাহ্ তা'আলা, (২) তাঁর যাবতীয় গুণাবলী এবং (৩) ফেরেশতা, (৪) আসমানী কিতাবসমূহ ও (৫) নবী-রাসূলগণের প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন এবং (৬) যেসব বিষয় হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন, সেগুলোকে সত্য জানা ও (৭) মুখে সে সমস্ত বিষয়কে স্বীকার করা। এ বিশ্বাস ও স্বীকৃতিই ঈমানের তাৎপর্য। তবে বিশেষ কোন প্রয়োজন কিংবা অপারকতার ক্ষেত্রে মুখের স্বীকৃতি রহিতও হয়ে যায়। যেমন, মূক ব্যক্তির ঈমান মৌখিক স্বীকৃতি ছাড়াও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন ঃ আ'মালে সালেহা কাকে বলে ?

উত্তর ঃ আ'মালে সালেহা অর্থ 'সৎকর্ম'। যেসব এবাদত-বন্দেগী ও সৎকর্ম আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে শিখিয়েছেন এবং বাতলিয়েছেন, সে সমুদয় বিষয়কেই আ'মালে সালেহা বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ এবাদত ও সৎকর্মসমূহও কি ঈমানের তাৎপর্যের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, পূর্ণাঙ্গ ঈমানে আ'মালে সালেহাও অন্তর্ভুক্ত। আ'মালে সালেহার দ্বারা ঈমানে ঔজ্জ্বল্য ও পূর্ণতা সৃষ্টি হয়। আ'মালে সালেহার অবর্তমানে ঈমান অপূর্ণ থেকে যায়।

প্রশ্ন ঃ এবাদত অর্থ কি ?

উত্তর ঃ এবাদত বলা হয় বন্দেগী ও উপাসনা করাকে। যে লোক বন্দেগী করে, তাকে বলা হয়, 'আবেদ'। আর যার বন্দেগী করা হয়, তাকে বলা হয়, মা'বূদ। আমাদের সবার সত্য ও প্রকৃত মা'বূদ হলেন সে অদ্বিতীয় আল্লাহ্, যিনি আমাদেরকে এবং সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা সবাই তাঁরই বান্দা। তিনি আমাদেরকে তাঁর এবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদের পক্ষে এবাদত করা ফরয।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন্ কোন্ সৃষ্টিকে এবাদত করার হুকুম দিয়েছেন ?

উত্তর ঃ মানুষ ও জিনদেরকে এবাদত করার হুকুম দিয়েছেন। এ দুই' সৃষ্টিকেই 'মুকাল্লাফ' বলা হয়। এছাড়া ফেরেশতা ও বাকী সব প্রাণী এবাদতের মুকাল্লাফ নয়।

প্রশ্ন ঃ জিন কারা ?

উত্তর ঃ জিনও আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় সৃষ্টি। তারা আগুন দ্বারা সৃষ্ট। জিনদের দেহ এমনি সূক্ষ্ম যে, আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু যখন তারা কোন মানুষ বা জীবজন্তুর আকৃতি ধারণ করে নেয়, তখন দেখা যেতে থাকে। নিজের আকৃতি পাল্টিয়ে মানুষ কিংবা অন্য কোন জীব-জন্তুর আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে পুরুষও রয়েছে এবং নারীও রয়েছে। তাদের সন্তানাদিও হয়।

প্রশ্ন ঃ এবাদত করার উপায় কি কি ?

উত্তর ঃ এবাদতের বহু উপায় রয়েছে, যেমন ঃ (১) নামায পড়া, (২) রোযা রাখা, (৩) যাকাত দেয়া, (৪) হজ্জ করা, (৫) কুরবানী করা, (৬) এ'তেকাফ করা, (৭) মানুষকে সৎকর্মের প্রতি নির্দেশ দেয়া, (৮) অসৎকর্ম থেকে বারণ করা, (৯) পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বড়দের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা, (১০) মসজিদ নির্মাণ করা, (১১) মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, (১২) দ্বীনী এলম পড়া, (১৩) দ্বীনী এলম পড়ানো, (১৪) এলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা, (১৫) আল্লাহ্র পথে আল্লাহ্র শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, (১৬) গরীব-দুঃখীদের অভাব মোচন করা, (১৭) ক্ষুধার্তদের খাওয়ানো, (১৮) তৃষ্ণার্তদের পানি পান করানো এবং এসব ছাড়াও সমস্ত এমন কাজ যা আল্লাহ্র হুকুম ও ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, সেই সবই এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। এসব কাজকেই আ'মালে সালেহা বলা হয়।

মা'সিয়াত ও গোনাহ্র বিবরণ

প্রশ্ন ঃ মা'সিয়াত অর্থ কি ?

উত্তর ঃ মা'সিয়াত অর্থ নাফরমানী করা ও হুকুম না মানা। যে কাজে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী হয়, সে কাজকে মা'সিয়াত বা গোনাহ্ বলা হয়।

গোনাহ্ বা পাপ করা খুবই খারাপ। আল্লাহ্ তা'আলার গযব, অসন্তোষ ও আযাব গোনাহ্র কারণেই হয়ে থাকে। গোনাহ্র মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহ্ হল কুফ্র ও শির্ক। কাফের ও মুশরিক চিরকাল দোযখে থাকবে। কাফের ও মুশরিকদের শাফা'আতও কেউ করবে না। কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেছেন যে, মুশরিককে আমি কখনও ক্ষমা করব না।

কুফ্র ও শির্কের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কুফ্র ও শির্ক কাকে বলা হয় ?

উত্তর ঃ যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা জরুরী, সেগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি বিষয়কে না মানাও কুফ্র। যেমন, কোন লোক যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে না মানে কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীকে অস্বীকার করে অথবা দু'তিনজন আল্লাহ্ মানে, কিংবা ফেরেশ্তাগণকে অস্বীকার করে, অথবা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবসমূহের মধ্যে কোন কিতাবকে অস্বীকার করে, কিংবা কোন পয়গম্বর বা নবী-রাসূলকে না মানে, অথবা তাকদীর বা নিয়তিকে অস্বীকার করে, কিংবা কিয়ামত দিবসকে না মানে অথবা আল্লাহ্ তা'আলার অকাট্য আহকাম বা নির্দেশাবলী থেকে কোন নির্দেশকে অস্বীকার করে অথবা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত কোন সংবাদকে মিথ্যা মনে করে, তবে এ সব অবস্থায় সে কাফের হয়ে যাবে।

আর শির্ক বলা হয় আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা কিংবা গুণাবলীর সাথে অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার যাত বা সত্তার সাথে শরীক করার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ যাত বা সত্তায় শরীক করার অর্থ হল দু'তিন খোদা মানতে থাকা। যেমন, খৃষ্টানরা তিন খোদা মানার দরুন মুশরিক, অগ্নি উপাসকরা দুই খোদা মানার জন্য মুশরিক এবং পৌত্তলিকরা বহু খোদা মানার কারণে মুশরিক হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঃ সিফত বা গুণাবলীতে শরীক করার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সিফত বা গুণের মত অন্য কারো জন্য কোন গুণ সাব্যস্ত করা শির্ক। কারণ, কোন সৃষ্টির মাঝে তা তিনি ফেরেশতাই হোন কিংবা নবী-রাসূলই হোন, ওলী-দরবেশই হোন কিংবা শহীদ

হোন, পীর-ফকীরই হোন অথবা ইমাম হোন, তাঁর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার অনুরূপ কোন গুণ থাকতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ শির্ক ফিস্‌সিফত (গুণে অংশীদার করা) কত প্রকার ?

উত্তর ঃ এটি বহু প্রকার হতে পারে। এখানে আমরা কয়েকটি প্রকার উল্লেখ করছি ঃ

(১) শিরক ফিল কুদরত। অর্থাৎ, অন্য কারো জন্য আল্লাহ্ তা'আলার মত কুদরত–সামর্থ্যগুণ সাব্যস্ত করা। যেমন, এরূপ মনে করা যে, অমুক নবী কিংবা ওলী কিংবা শহীদ প্রমুখ বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন। কিংবা ছেলে-মেয়ে দিতে পারেন অথবা মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দিতে পারেন কিংবা রুযী-রোযগার দান করতে পারেন অথবা জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হাতে কিংবা কাউকে লাভ-ক্ষতির সম্মুখীন করার কুদরত বা ক্ষমতা তাঁর হাতে রয়েছে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ই শির্ক।

(২) শির্ক ফিল এল্‌ম। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার অনুরূপ অন্য কারো জন্য এল্‌ম গুণ সাব্যস্ত করা। উদাহরণত, এমন মনে করা যে, আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায় অমুক নবী কিংবা ওলী প্রমুখেরও গায়েবের জ্ঞান ছিল বা আল্লাহ্ তা'আলার অনুরূপ অণু-পরমাণুর জ্ঞান তাঁদের রয়েছে অথবা আমাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা অবগত কিংবা কাছের বা দূরের সব বিষয়াদির খবর তাঁদের রয়েছে। এসবই শির্ক ফিল এল্‌ম তথা জ্ঞানে শরীক করার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) শির্ক ফিসসাম্‌য়ে ওয়াল বছর। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার শ্রবণ ও দর্শন সম্পর্কিত গুণের সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা। যেমন, এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, অমুক নবী বা ওলী আমাদের যাবতীয় কথা কাছে কিংবা দূরে থেকেও শুনে ফেলেন কিংবা আমাদেরকে ও আমাদের কাজকর্মসমূহকে সবখান থেকেই দেখতে পান। এ সবই শির্ক।

(৪) শির্ক ফিল হুক্‌ম। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার মত অন্য কাউকে হাকেম তথা হুকুমের অধিকারী মনে করা এবং তাঁর হুকুমকে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের মত মান্য করা। যেমন, কোন পীর সাহেব হুকুম করলেন যে, এ ওযীফাটি আসরের নামাযের পূর্বে পাঠ করবে। তখন এ হুকুমকে এমন অপরিহার্য ও জরুরী ভিত্তিতে পালন করা যে, ওযীফা পুরো করতে গিয়ে যদি আসরের নামাযের সময় মাকরূহ হয়ে যায় কিংবা নামায কাযা হয়ে যায়, তবুও তার পরওয়া না করা। এটিও শির্ক।

(৫) শির্‌ক ফিল এবাদত। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার মত অন্য কাউকে এবাদতের যোগ্য মনে করা। যেমন, কোন কবর কিংবা পীরকে সজদা করা কিংবা কারো জন্য রুকূ করা কিংবা পীর-পয়গম্বর এবং ওলী-ইমামের নামে রোযা রাখা কিংবা তাদের বা অন্য কারো নামে মান্নত মানা কিংবা কোন কবর অথবা পীরের বাড়ী-ঘর কা'বার মত তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করা। এগুলো সবই শির্‌ক ফিল এবাদত।

প্রশ্ন ঃ এসব ছাড়া আরও কোন আফআলে শির্‌কিয়া তথা শির্‌কী কাজকর্ম আছে কিনা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এমন বহু কাজকর্ম রয়েছে, যাতে শির্‌কের সংমিশ্রণ রয়েছে। সেসমস্ত কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। কাজগুলো এই ঃ জ্যোতিষ গণকদের কাছে গায়েবের খবর জিজ্ঞাসা করা, পণ্ডিতদেরকে হাত দেখানো, কারো দ্বারা ফাল (ভাল-মন্দ ভাগ্য) খোলানো, কলেরা-বসন্ত কিংবা কোন রোগব্যাধিকে ছোঁয়াচে মনে করা এবং এমন মনে করা যে, একজনের রোগ অন্য জনের লেগে যায়। তাজিয়া নির্মাণ করা, এ উপলক্ষে নিশান উড়ানো, কবরের উপর ভোগ দেয়া কিংবা নযর নিয়ায দেয়া, আল্লাহ্ তা'আলাকে ছাড়া কারো নামে কসম খাওয়া, মূর্তি বা ছবি বানানো কিংবা ছবির সম্মান করা, কোন পীর বা ওলীকে অভাব পূরণকারী ও বিপদ মুক্তকারী বলে ডাকা, কোন পীর-ফকীরের নামে মাথায় টিকি রাখা কিংবা মহররমে ইমামদের নামে ফকীর সাজা, কবরে মেলা বসানো প্রভৃতি।

বেদআতের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কুফ্‌র ও শির্‌কের পর বড় গোনাহ্ কোন্‌টি ?

উত্তর ঃ কুফ্‌র ও শির্‌কের পর বেদআত হল বড় গোনাহ্। বেদআত সেসব বিষয়কে বলা হয়, যার মূল শরীঅত দ্বারা প্রমাণিত নয়। অর্থাৎ, কোরআন-হাদীসে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবয়ে তাবেঈনের আমলে তার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, অথচ সেগুলোকে দ্বীনের কাজ মনে করে সম্পাদন বা বর্জন করা হয়।

বেদআত খুবই খারাপ জিনিস। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদআতকে প্রত্যাখ্যানযোগ্য বা বর্জনীয় বলেছেন এবং যে ব্যক্তি বেদআত

প্রবর্তন করে, তাকে দ্বীন ধ্বংসকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন ঃ বেদআত হল পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই দোযখে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ কয়েকটি বেদআত কাজের কথা বলুন ?

উত্তর ঃ মানুষ হাজার হাজার বেদআত উদ্ভাবন করেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এই ঃ কবর পাকা করা, কবরের উপর গুম্বজ নির্মাণ করা, ধুমধাম করে ওরস করা, কবরে বাতি জ্বালানো, কবরের উপর চাদর বা গিলাফ চড়ানো, মৃতের বাড়ীতে খাবার জন্য সমবেত হওয়া, বিয়ে-শাদীতে ইসলামী চেতনাবিরোধী কুসংস্কার পালন করা এবং যে কোন জায়েয ও মুস্তাহাব কাজে নিজের পক্ষ থেকে এমন শর্ত আরোপ করা, যার শরীঅতসম্মত কোন প্রমাণ নেই। এ সবই বেদআত।

অন্যান্য গোনাহ্র বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কুফ্র ও শির্ক ও বেদআত ছাড়া আর কোন্ কোন্ বিষয় গোনাহ্ ?

উত্তর ঃ কুফ্র, শির্ক ও বেদআত ছাড়া আরও বহু গোনাহ্ রয়েছে। যেমন, মিথ্যা বলা, নামায না পড়া, রোযা না রাখা, যাকাত না দেয়া, ধন-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা, মদ্যপান করা, চুরি করা, যিনা করা, গীবত বা পরনিন্দা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, কাউকে অন্যায়ভাবে মারধর করা কিংবা কষ্ট দেয়া, চোগলখুরী করা, প্রতারণা করা, পিতা মাতা ও ওস্তাদের নাফরমানী করা, নিজের ঘরে বা কামরায় ছবি আঁটা, আমানতে খেয়ানত করা, মানুষকে হীন ও নিকৃষ্ট জ্ঞান করা, জুয়া খেলা, গালি-গালাজ করা, নাচ দেখা, সূদ নেয়া ও দেয়া, দাড়ি মুণ্ডানো, টাখনুর নীচে কাপড় পরা, অপব্যয় করা, খেল তামাশা, নাটক-থিয়েটার দেখা প্রভৃতি। এছাড়াও বহু গোনাহ্র কাজ আছে, যা পরবর্তীতে তোমরা বড় কিতাবে পাবে।

প্রশ্ন ঃ গোনাহ্গার (যে গোনাহ্র কাজ করে, সে) ব্যক্তি মুসলমান থাকে কিনা ?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি এমন গোনাহ্ করে, যাতে কুফ্র ও শির্ক বিদ্যমান থাকে, সে ব্যক্তি মুসলমান থাকে না; বরং কাফের ও মুশরিক হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি বেদআতের কাজ করে, সে মুসলমান থাকলেও তার ইসলাম অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। এ ধরনের লোককে মুবতাদে' ও বেদআতী

বলা হয়। আর যারা কুফ্‌র, শির্‌ক ও বেদআত ছাড়া কোন কবীরা গোনাহ্ করে, সে-ও মুসলমান কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ মুসলমান। তাকে ফাসেক বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ কারো দ্বারা যদি কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, তাহলে আযাব থেকে বাঁচার উপায় কি ?

উত্তর ঃ তওবা করে নিলে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহ্ মাফ করে দেন। তওবা বলা হয়, নিজের গোনাহ্‌র দরুন লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে কেঁদে-কেটে একথা বলা যে, হে আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ মাফ করে দাও। আর সাথে সাথে অন্তরে এ ওয়াদা করা যে, এখন থেকে আর কখনও গোনাহ্ করব না। মনে রাখতে হবে, শুধু মুখে তওবা তওবা বলা প্রকৃত তওবা নয়।

প্রশ্ন ঃ তওবা করে নিলে কি সব রকম গোনাহ্‌ই মাফ হতে পারে ?

উত্তর ঃ যে গোনাহ্‌র সাথে কোন বান্দার সম্পর্ক নেই; শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হক যে, তিনি নাফরমানী করার জন্য শাস্তি দিবেন, এমন সমস্ত গোনাহ্‌ই তওবার দ্বারা মাফ হতে পারে। এমন কি কুফ্‌র ও শির্‌কের মত গোনাহ্‌ও সত্য ও সঠিক তওবাতে মাফ হয়ে যায়। কিন্তু যেসব গোনাহ্‌র সাথে কোন বান্দার সম্পর্ক রয়েছে যেমন, কোন এতীমের সম্পদ খেয়ে নিলে কিংবা কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করল কিংবা অত্যাচার করল, এমন গোনাহ্‌কে হক্কুল এবাদ বলা হয়। এ সব শুধুমাত্র তওবায় মাফ হয় না; বরং সেগুলোর ক্ষমার জন্য প্রথমে সে ব্যক্তির হক আদায় করতে হবে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিতে হবে এবং তারপর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তওবা করলেই ক্ষমার আশা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ তওবা কোন্ সময় পর্যন্ত কবুল হয় ?

উত্তর ঃ যখন মানুষ মরতে শুরু করে, আযাবের ফেরেশতা তার সামনে এসে যায় এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায়, তখন তার তওবা কবুল বা গ্রহণযোগ্য নয়। আর এ অবস্থার পূর্ব পর্যন্ত সব সময়ের তওবাই কবুল হয়।

প্রশ্ন ঃ গোনাহ্‌গার ব্যক্তি তওবা না করে মরে গেলে বেহেশতে যাবে কিনা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, কাফের ও মুশরিকদের ছাড়া অন্যান্য সমস্ত গোনাহ্‌গার নিজেদের গোনাহ্‌র শাস্তি ভোগ করার পর বেহেশতে যাবে। তাছাড়া

এমনটাও সম্ভব যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুফ্র ও শির্ক ছাড়া বাকী গোনাহ্ সমূহ বিনা শাস্তিতে কারো শাফা'আতে কিংবা বিনা শাফা'আতে মাফ করে দিতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীর প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি মৃত ব্যক্তির কোন উপকার করতে পারে কিনা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, মৃত ব্যক্তিকে দৈহিক ও আর্থিক এবাদতের সওয়াব পৌঁছাতে পারে। অর্থাৎ, জীবিত ব্যক্তিরা যদি কোন সৎকাজ করে যেমন, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে, দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্র রাহে সদকা-খয়রাত করে, কোন ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ায়, তাহলে এসব কাজের সওয়াব আল্লাহ্র তরফ থেকে তারা পাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নিজের রহমতে এ অধিকারও দিয়েছেন যে, যদি এমন সৎকর্ম সম্পাদনকারী নিজের সওয়াব কোন মৃত ব্যক্তিকে পৌঁছাতে চায়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দো'আ করবে যে, হে আল্লাহ্! এ কাজের সওয়াব আমি অমুক ব্যক্তিকে দান করলাম, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই মৃতকে সে সওয়াব পৌঁছে দেন।

সওয়াব পৌঁছানোর জন্য কোন বিশেষ বস্তু-সামগ্রী কিংবা কোন বিশেষ সময় অথবা বিশেষ ব্যবস্থা নিজের পক্ষ থেকে নির্ধারিত না করা উচিত। বরং যখন যা ব্যবস্থা হয়, তাই আল্লাহ্র ওয়াস্তে কোন হকদারকে দিয়ে তার সওয়াব দান করা উচিত। আনুষ্ঠানিকতা বা রেওয়াজ রসমের অনুবর্তিতা কিংবা লোক দেখানো এবং নাম-ধামের জন্য বিরাট বিরাট দাওয়াত, যিয়াফতের আয়োজন করা কিংবা ঋণ-ধার করে রেওয়াজ পূর্ণ করা খুবই খারাপ।

দ্বিতীয় পর্ব

আরকান শিক্ষা বা ইসলামী আমল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কেরাআতের কয়েকটি হুকুমের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ যদি ফজর, মাগরিব ও এশার নামায একা পড়ে, তবে জাহ্‌র করা (অর্থাৎ, আওয়ায করে পড়া) ওয়াজিব কিনা ?

উত্তর ঃ ওয়াজিব নয়, কিন্তু আওয়ায করে পড়া উত্তম।

প্রশ্ন ঃ এসব নামায কাযা পড়তে হলে কি হুকুম ?

উত্তর ঃ কাযার ক্ষেত্রে ইমামকে জাহ্‌র করে পড়াই উচিত। আর মুনফারিদের এখতিয়ার রয়েছে; আওয়ায করেও পড়তে পারে, আস্তে আস্তেও পড়তে পারে।

প্রশ্ন ঃ ফরয নামাযে কতটুকু কেরাআত সুন্নত ?

উত্তর ঃ সফরের অবস্থায় সূরা ফাতেহার পর যে কোন সূরা ইচ্ছা পড়তে পারে। অবশ্য একামত (অর্থাৎ, নিজ বাড়িতে থাকা) অবস্থায় কেরাআতের নির্দিষ্ট পরিমাণ পড়া সুন্নত।

প্রশ্ন ঃ একামত অবস্থায় কেরাআতের সুন্নত নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ একামত অবস্থায় ফজর ও যোহরের নামাযে 'তেওয়ালে মুফাসসাল' পড়া, আসর ও এশার নামাযে 'আওসাতে মুফাস্‌সাল' এবং মাগরিবের নামাযে 'কেসারে মুফাস্‌সাল' পড়া সুন্নত।

প্রশ্ন ঃ তেওয়ালে মুফাস্‌সাল, আওসাতে মুফাস্‌সাল এবং কেসারে মুফাস্‌সাল কাকে বলে ?

উত্তর ঃ কোরআন মজীদের ছাব্বিশতম পারার সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরাগুলোকে তেওয়ালে মুফাস্‌সাল বলা হয়।

আর সূরা তারিক থেকে সূরা লাম ইয়াকুন পর্যন্ত সূরাগুলোকে আওসাতে মুফাস্‌সাল এবং সূরা ইযাযুল যিলাতি থেকে সূরা নাস অর্থাৎ, কোরআনের শেষ পর্যন্তের সূরাগুলোকে কেসারে মুফাস্‌সাল বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ এসব সুন্নত কেরাআত ইমামের জন্য নাকি মুনফারিদের জন্য ?

উত্তর ঃ ইমাম ও মুনফারিদ উভয়ের জন্য এ কেরাআত সুন্নত।

প্রশ্ন ঃ মুকীম অবস্থায় যদি কোন প্রয়োজন বশত সুন্নত কেরাআত ছেড়ে দেয়, তবে কি হুকুম ?

উত্তর ঃ জায়েয।

প্রশ্ন ঃ কোন নামাযে কি কোন বিশেষ সূরা এমনভাবে নির্ধারিত আছে যে, সেটি ছাড়া অন্য সূরা জায়েয হবে না ?

উত্তর ঃ এভাবে কোন নামাযের জন্য কোন সূরা নির্ধারিত নেই। সহজসাধ্যতার জন্য শরীঅত যে কোন জায়গা থেকে কোরআন মজীদ পড়ার অনুমতি দিয়েছে। কাজেই নিজের পক্ষ থেকে সেটা নির্ধারণ করে নেয়া শরীঅতের খেলাফ বা পরিপন্থী।

প্রশ্ন ঃ ফজরের সুন্নত নামাযে সুন্নত কেরাআত কি ?

উত্তর ঃ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় ফজরের সুন্নতের প্রথম রাকআতে قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এবং দ্বিতীয় রাকআতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তেন।

প্রশ্ন ঃ বিত্‌রের নামাযে সুন্নত কেরাআত কি ?

উত্তর ঃ প্রথম রাকআতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ও দ্বিতীয় রাকআতে قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এবং তৃতীয় রাকআতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পাঠ করা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

জামাআত ও ইমামতের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ ইমামত বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ ইমামত অর্থ নেতা বা সর্দার হওয়া। নামাযে যে ব্যক্তি গোটা জামাআতের সর্দার হবে এবং সমস্ত মুক্তাদী তাঁর অনুসরণ করবে, তাঁকে ইমাম বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ জামাআত অর্থ কি ?

উত্তর ঃ মিলেমিশে একত্রে নামায পড়াকে জামাআত বলা হয়, যাতে একজন ইমাম থাকেন আর সবাই মুক্তাদী হয়।

প্রশ্ন ঃ জামাআত ফরয না ওয়াজিব, নাকি সুন্নত ?

উত্তর ঃ জামাআত সুন্নতে মুআক্কাদা। এর প্রচুর তাকীদ রয়েছে। কোন কোন আলেম-ওলামা তো একে ফরয এবং ওয়াজিবও বলেন। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জামাআতে প্রচুর উপকারিতা রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ জামাআতে নামায পড়ার উপকারিত কি কি ?

উত্তর ঃ এক নামাযে সাতাশ নামাযের সওয়াব পাওয়া, পাঁচ বেলা মুসলমানদের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ এবং এর মাধ্যমে পারস্পরিক ঐক্য ও ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া, অন্যদের দেখে মনে এবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া, নামাযে মন বসা, জামাআতে বুযুর্গ, নেক ও সৎ ব্যক্তিদের বরকতে গোনাহ্-গারদের নামাযও কবুল হয়ে যাওয়া, অজানা লোকদের পক্ষে জানা লোকদের কাছে মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে জেনে নেয়া সহজ হওয়া, অভাবগ্রস্ত ও গরীব লোকদের অবস্থা অবগত হতে থাকা, একটি বিশেষ এবাদত অর্থাৎ, নামাযের মহিমা প্রকাশ ছাড়াও আরো বহু উপকারিতা রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কোন্ লোকদের জন্য জামাআতে না আসার অনুমতি রয়েছে ?

উত্তর ঃ মহিলা, নাবালেগ শিশু, অসুস্থ, অসুস্থের সেবাকারী, আতুর, লেংড়া, অথর্ব, কর্তিত পা, অত্যধিক বুড়ো, অন্ধ প্রভৃতির উপর জামাআতে হাজির হওয়া অপরিহার্য নয়।

প্রশ্ন ঃ এমন কি ওযর থাকতে পারে, যার জন্য সুস্থ সবলের পক্ষে জামাআতে না আসা জায়েয হয়ে যায় ?

উত্তর ঃ কঠিন বৃষ্টি, পথে অতিরিক্ত কাদা, অত্যধিক শীত, রাতে প্রবল ঝড়, সফর যেমন– রেল বা জাহাজ ছেড়ে যাবার সময় হয়ে যাওয়া, পায়খানা-পেশাবের বেগ হওয়া কিংবা প্রবল ক্ষুধার সময় খাবার সামনে

এসে যাওয়া প্রভৃতি ওযরের দরুন জামাআতে উপস্থিতির কড়াকড়ি শিথিল হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ কোন্ নামাযসমূহে জামাআত সুন্নতে মুআক্কাদা অথবা ওয়াজিব ?

উত্তর ঃ সমস্ত ফরয নামায ও দুই ঈদের নামায জামাআতের সাথে পড়া সুন্নতে মুআক্কাদা। তারাবীহ্র নামাযের জামাআত সুন্নতে কেফায়া এবং রমযানে বিত্র নামাযের জামাআত মুস্তাহাব।

প্রশ্ন ঃ কম-সে-কম কতজন লোক হলে জামাআত হয় ?

উত্তর ঃ কম-সে-কম দুইজন লোকই জামাআতের জন্য যথেষ্ট; একজন মুক্তাদী এবং একজন ইমাম; কিন্তু এ অবস্থায় মুক্তাদী ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে। আর যখন দু'জন মুক্তাদী হয়, তখন ইমামকে সামনে এগিয়ে দাঁড়াতে হবে।

প্রশ্ন ঃ জামাআতে লোকদের কিভাবে দাঁড়ানো উচিত ?

উত্তর ঃ একজনের সাথে আরেকজন মিলে এবং কাতার সোজা করে দাঁড়াতে হবে। মাঝে কোন খালি জায়গা রাখবে না। বালকদের পেছনে দাঁড় করাবে। বয়স্ক লোকদের মাঝে বালকদেরকে দাঁড় করানো মাকরূহ। মহিলাদের কাতার বা সারি বালকদেরও পেছনে থাকা উচিত।

প্রশ্ন ঃ ইমামের নামায নষ্ট হয়ে গেলে মুক্তাদীদের নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে কিনা?

উত্তর ঃ যখন ইমামের নামায নষ্ট হয়ে যায়, তখন মুক্তাদীদের নামাযও নষ্ট হয়ে যাবে; মুক্তাদীদের জন্যও নিজেদের নামায পুনরায় পড়া জরুরী হবে।

প্রশ্ন ঃ ইমামতের অধিকারী কোন্ ব্যক্তি ?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ আলেম অর্থাৎ, যিনি নামাযের মাসাআলা-মাসায়েল সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হবেন। তবে শর্ত হল এই যে, তার আমলও ভাল হতে হবে। অতঃপর যার কোরআন বেশী স্মরণ আছে এবং পড়েও ভাল। তারপর যিনি অধিক মুত্তাকী পরহেযগার হবেন। তারপর যিনি অধিক বয়স্ক। তারপর যিনি সদাচার এবং ব্যক্তিগত ভদ্রতার অধিকারী। তারপর যিনি বেশী সুন্দর এবং গুরু গম্ভীর। অতঃপর যিনি বংশ মর্যাদার অধিকারী।

প্রশ্ন ঃ মসজিদে যদি ইমাম নির্দিষ্ট থাকে এবং জামাআতের সময় তাঁর চাইতে উত্তম কোন লোক এসে যান, তবে ইমামতের বেশী অধিকারী কে ?

উত্তর ঃ নির্ধারিত ইমাম সে অপরিচিত আগন্তুক অপেক্ষা বেশী হকদার, যদিও অপরিচিত ব্যক্তি নির্ধারিত ইমাম অপেক্ষা অধিক উত্তম হন।

প্রশ্ন ঃ কাদের পেছনে নামায মাকরূহ ?

উত্তর ঃ (১) বেদআতী, (২) ফাসেক, (৩) মূর্খ গোলাম, (৪) মূর্খ গেঁয়ো, (৫) বাছবিচারহীন অন্ধ এবং (৬) মূর্খ জারজ সন্তানের পেছনে নামায মাকরূহ।

কিন্তু গোলাম ও গ্রাম্য লোকটি যদি আলেম হয় এবং অন্ধ যদি বাছবিচার করে চলে এবং আলেম হয় কিংবা কোরআন মজীদ ভাল পড়ে, জারজ সন্তান যদি আলেম, সৎকর্মী হয় এবং তার চাইতে উত্তম কোন লোক উপস্থিত না থাকে, তবে তাদের ইমামত নিঃসংকোচে জায়েয।

প্রশ্ন ঃ কোন্ লোকদের পেছনে নামায একেবারেই জায়েয নয় ?

উত্তর ঃ (১) পাগল, (২) নেশাগ্রস্ত, (৩) কাফের বা মুশরিকের পেছনে তো কোন লোকের নামাযই জায়েয হয় না। এছাড়া (৪) নাবালেগের পেছনে বালেগের, (৫) মহিলার পেছনে পুরুষের নামায শুদ্ধ হয় না। তেমনিভাবে– (৬) যে ব্যক্তি নিয়মিত ওযূ-গোসল করে থাকবে, তার নামায মা'যূরের পেছনে হয় না। (৭) যার সতর পূর্ণ আবৃত রয়েছে তার নামায এমন লোকের পেছনে শুদ্ধ হয় না, যার সতর অনাবৃত। (৮) যে রুকূ' সজদা করতে পারে, তার নামায ইশারায় রুকূ সজদা আদায়কারীর পেছনে হয় না। তাছাড়া (৯) ফরয নামাযীর নামায নফলনামাযীর পেছনে হয় না। তেমনিভাবে (১০) এক ফরয (অর্থাৎ, যোহর) আদায়কারীর নামায অন্য ফরয (যেমন, আসর) আদায়কারীর পেছনে হয় না।

প্রশ্ন ঃ নাবালেগ ছেলের পেছনে তারাবীহ্ যায়েয কিনা ?

উত্তর ঃ তারাবীহ্ও নাবালেগের পেছনে যায়েয নয়। অবশ্য ছেলের বয়স পনের হয়ে গেলে সাবালকত্বের অন্য কোন লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও তার পেছনে তারাবীহ্ ও ফরয নামায জায়েয।

মুফসেদাতে নামাযের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ মুফসেদাতে নামায কাকে বলে ?

উত্তর ঃ মুফসেদাতে নামায সেসব বিষয়কে বলা হয়, যার দরুন নামায ফাসেদ হয়ে যায়। অর্থাৎ, ভেঙ্গে যায় এবং তা পুনরায় পড়া জরুরী হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ঃ মুফসেদাতে নামায কি কি ?

উত্তর ঃ (১) নামাযে কথা বলা, ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা ভুলক্রমে, অল্প হোক কিংবা বেশী সব অবস্থাতেই নামায ভেঙ্গে যায়। (২) সালাম করা। অর্থাৎ, কোন লোককে সালাম জানানোর উদ্দেশ্যে সালাম, তাসলীম, আস্‌সালামু আলাইকুম কিংবা এমনি ধরনের কোন বাক্য বলে দেয়া। (৩) সালামের উত্তর দেয়া কিংবা হাঁচির উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলা অথবা নামাযের বাইরের কোন লোকের দো'আর পর আমীন বলা। (৪) খারাপ খবর শুনে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' অথবা কোন সুসংবাদ শুনে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা অথবা কোন আশ্চর্য সংবাদের উপর 'সুবহানাল্লাহ্' বলা। (৫) কোন কষ্ট বা ব্যথা-বেদনার দরুন আহ্ উহ্ করা। (৬) নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে লোকমা দেয়া অর্থাৎ, কেরাআত বাতলে দেয়া। (৭) কোরআন শরীফ দেখে দেখে পড়া। (৮) কোরআন পাঠ করতে গিয়ে কোন কঠিন ভুল করা। (৯) আমলে কাসীর করা অর্থাৎ, এমন কোন কাজ করা যাতে দর্শক মনে করে যে, লোকটি নামায পড়ছে না। (১০) খাওয়া দাওয়া করা, তা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলক্রমে। (১১) দুই কাতার পরিমাণ চলাফেরা করা। (১২) বিনা ওযরে কেবলার দিক থেকে বুক ফিরিয়ে নেয়া। (১৩) নাপাক জায়গায় সজদা করা। (১৪) সতর অনাবৃত হয়ে যাওয়ার অবস্থায় এক রুকন পরিমাণ সময় অবস্থান করা। (১৫) দো'আ করতে গিয়ে এমন জিনিসের কামনা করা, যা মানুষের কাছে কামনা করা হয়। যেমন, হে আল্লাহ! আমাকে আজকে একশ টাকা দিয়ে দাও। (১৬) ব্যথা কিংবা বিপদাপদের দরুন এমনভাবে কাঁদা, যাতে শব্দে অক্ষর প্রকাশ পেয়ে যায়। (১৭) সাবালক ব্যক্তির নামাযের ভেতরে অট্ট বা সশব্দে হাসা এবং (১৮) ইমাম থেকে এগিয়ে যাওয়া প্রভৃতি।

নামাযের মাকরূহসমূহের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ নামাযে কতগুলো বিষয় মাকরূহ ?

উত্তর ঃ 'সাদল' অর্থাৎ, কাপড় লটকানো। যেমন, চাদর মাথায় দিয়ে তার উভয় কানা লটকে দেয়া কিংবা আচকান বা চোগার আস্তিনে হাত না ঢুকিয়ে কাঁধে ফেলে রাখা, (২) কাপড়কে মাটি (অথবা ধুলা বালু) থেকে বাঁচানোর জন্য হাতে ধরে রাখা কিংবা গুটানো, (৩) নিজের কাপড় কিংবা শরীর নিয়ে খেলা করা, (৪) যেসব কাপড় পরে সভা-সমাবেশে

যাওয়া পছন্দ নয়, এমন সাধারণ কাপড়ে নামায পড়া, (৫) মুখে টাকা-পয়সা কিংবা এমন কোন জিনিস রেখে নামায পড়া, যার কারণে কেরাআত পাঠে অসুবিধা হয়। আর যদি তার কেরাআত পড়াই দুষ্কর হয়, তবে নামায একেবারেই হবে না, (৬) আলস্য ও অসতর্কতার কারণে খোলা মাথায় নামায পড়া, (৭) পায়খানা-পেশাবের বেগ নিয়ে নামায পড়া, (৮) চুল মাথার উপর একত্রিত করে খোপা বাঁধা। (৯) কঙ্কর সরানো, তবে সজদা করতে অসুবিধা হলে একবার সরালে অসুবিধা নেই, (১০) আঙ্গুল ফুটানো কিংবা এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলে ঢুকানো, (১১) কোমর, কাঁকাল বা কটিতে হাত রাখা, (১২) কেবলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিংবা শুধু চোখে এদিক সেদিক দেখা, (১৩) কুকুরের মত বসা। অর্থাৎ, রান দু'টি খাড়া করে বসা এবং রানগুলোকে পেটের সাথে ও হাঁটুকে বুকের সাথে মিলিয়ে হাত মাটিতে রেখে বসা, (১৪) সজদার সময় হাত (কব্জির পর থেকে কনুই পর্যন্ত) মাটিতে বিছিয়ে দেয়া পুরুষের জন্য মাকরূহ, (১৫) কোন এমন মানুষের দিকে নামায পড়া, যে নামাযীর দিকে মুখ করে বসে আছে, (১৬) হাত কিংবা মাথার ইশারায় সালামের জওয়াব দেয়া, (১৭) বিনা ওযরে আসন করে বসা, (১৮) ইচ্ছাকৃতভাবে হাই তোলা কিংবা হাই বন্ধ করতে পারা অবস্থায় বন্ধ না করা, (১৯) চোখ বন্ধ করে নেয়া। কিন্তু নামাযে একাগ্রতার উদ্দেশ্যে বন্ধ করলে মাকরূহ নয়, (২০) ইমামের পক্ষে মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ানো। তবে পা যদি মেহরাবের বাইরে থাকে, তবে মাকরূহ নয়, (২১) একা ইমামের এক হাত পরিমাণ উঁচুতে দাঁড়ানো। তবে যদি তাঁর সাথে কিছু মুক্তাদীও থাকে, তবে মাকরূহ নয়, (২২) এমন কাতারের পেছনে একা দাঁড়ানো যাতে জায়গা খালি থাকে, (২৩) কোন প্রাণীর ছবি আঁকা কাপড় পরে নামায পড়া, (২৪) এমন জায়গায় নামায পড়া যে, নামাযীর মাথার উপর, তার সামনে কিংবা ডানে-বামে কিংবা সজদার স্থানে ছবি থাকে, (২৫) আয়াত, সূরা কিংবা তসবীহ আঙ্গুলে গণা, (২৬) চাদর কিংবা কোন কাপড় এমনভাবে জড়িয়ে নামায পড়া, যার ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি হাত বের করা যায় না, (২৭) নামাযে গামোড়া দেয়া অর্থাৎ, অলসতা দূর করা, (২৮) পাগড়ির পেঁচের উপর সজদা করা এবং (২৯) সুন্নতের খেলাফ নামাযে কোন কাজ করা।

বিত্‌র নামাযের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ বিত্‌রের নামায ওয়াজিব নাকি সুন্নত ?

উত্তর ঃ বিত্‌রের নামায ওয়াজিব। এ নামায পড়ার তাকীদ ফরয নামাযেরই সমান এবং ছুটে গেলে কাযা পড়া ওয়াজিব। বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃত ছাড়া বিরাট গোনাহ্।

প্রশ্ন ঃ বিত্‌র নামায কয় রাকআত ?

উত্তর ঃ বিত্‌রের নামায তিন রাকআত। দু'রাকআত পড়ার পর কা'দাহ্ (বৈঠক) করা হয় এবং আত্তাহিয়্যাত পড়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। অতঃপর এক রাকআত পড়ে (পুনরায়) কা'দাহ্ (তথা বৈঠক) করে আত্তাহিয়্যাত, দুরূদ শরীফ ও দো'আ পড়ে সালাম ফেরাতে হয়।

প্রশ্ন ঃ বিত্‌রের নামাযের সাথে অন্য নামাযের পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ এর তৃতীয় রাকআতে দো'আয়ে কুনূত পড়তে হয়। তার নিয়ম হল এই যে, তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা শেষ করে আল্লাহু আকবার বলে হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে আবার বাঁধতে হবে এবং তারপর দো'আয়ে কুনূত পড়বে। তারপর রুকূতে যাবে এবং বাকী নামায যথারীতি পূর্ণ করবে।

প্রশ্ন ঃ দো'আয়ে কুনূত জোরে পড়া উচিত, নাকি আস্তে আস্তে ?

উত্তর ঃ ইমাম হোন কি মুনফারিদ সবাইকেই দো'আয়ে কুনূত আস্তে আস্তে পড়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ দো'আয়ে কুনূত মনে না থাকলে কি করবে ?

উত্তর ঃ অন্য কোন দো'আ পড়ে নেবে। যেমন ঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

প্রশ্ন ঃ মুক্তাদীর দো'আয়ে কুনূত শেষ করার আগেই ইমাম রুকূ করে ফেললে মুক্তাদী কি করবে ?

উত্তর ঃ দো'আয়ে কুনূত ছেড়ে দিয়ে রুকূতে চলে যাবে।

সুন্নত ও নফল নামাযের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ সুন্নতে মুআক্কাদা নামাযের সংখ্যা কত ?

উত্তর ঃ (১) ফজর নামাযের ফরযের পূর্বে দু'রাকআত, (২) যোহর ও জুমুআর নামাযের ফরযের পূর্বে (এক সালামে) চার রাকআত, (৩) জোহরের ফরযের পর দু'রাকআত, (৪) জুমুআর নামাযের পর (এক সালামে) চার রাকআত, (৫) মাগরিবের ফরযের পর দু'রাকআত এবং (৬) এশার ফরযের পর দু'রাকআত সুন্নতে মুআক্কাদা। এছাড়া রমযান শরীফে তারাবীহ্‌র নামাযের কুড়ি রাকআত সুন্নতে মুআক্কাদা।

প্রশ্ন ঃ সুন্নতে গায়ের মুআক্কাদার সংখ্যা কত ?

উত্তর ঃ (১) আসর নামাযের পূর্বে চার রাকআত, (২) এশার সুন্নতে মুআক্কাদার পর দু'রাকআত, (৩) মাগরিবের সুন্নতে মুআক্কাদার পর ছ'রাকআত (৪) জুমুআর পরের সুন্নতে মুআক্কাদার পর দু'রাকআত, (৫) তাহিয়্যাতুল ওযূর দু'রাকআত, (৬) তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু'রাকআত, (৭) চাশ্‌তের নামাযের চার বা আট রাকআত, (৮) বিত্‌রের নামাযের পর দু'রাকআত, (৯) তাহাজ্জুদের নামাযের চার, ছয় বা আট রাকআত, (১০) সালাতুত্তাস্‌বীহ্‌, (১১) এস্তেখারার নামায, (১২) তওবার নামায, (১৩) হাজতের নামায প্রভৃতি সুন্নতে গায়ের মুআক্কাদা।

প্রশ্ন ঃ সুন্নতসমূহ মসজিদে পড়া ভাল, নাকি বাড়ীতে ?

উত্তর ঃ সমস্ত সুন্নত ও নফল নামায বাড়ীতে পড়াই উত্তম। তবে কয়েকটি সুন্নত ও নফল যেমন, তারাবীহ্‌, তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও সূর্য গ্রহণের নামায, এগুলো মসজিদে পড়া উত্তম।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ সময় নফল নামায পড়া মাকরূহ ?

উত্তর ঃ (১) সুবহে সাদেক হওয়ার পর ফজরের দু'রাকআত সুন্নত ছাড়া ফরযের পূর্বে কোন নফল নামায মাকরূহ। (২) ফজরের ফরযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে। (৩) আসরের ফরযের পর সূর্য পরিবর্তিত হওয়ার আগে আগে নফল নামায মাকরূহ। কিন্তু এ তিন সময়ে ফরয বা ওয়াজিব নামাযের কাযা ও জানাযার নামায এবং সজদায়ে তেলাওয়াত নিঃসঙ্কোচে জায়েয। (৪) সূর্যোদয় শুরু হওয়ার পর থেকে এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠা পর্যন্ত। (৫) ঠিক দুপুরে এবং (৬) সূর্যের রং পরিবর্তিত হয়ে যাবার পর থেকে ডুবা পর্যন্ত যে কোন নামায মাকরূহ। অবশ্য সেদিনকার আসরের নামায না পড়ে থাকলে সূর্য পরিবর্তিত হয়ে

গেলে এবং সূর্যের ডুবন্ত অবস্থায়ও পড়ে নেয়া জায়েয। তেমনিভাবে জুমুআর খোতবার সময় সুন্নত ও নফল নামায মাকরূহ।

প্রশ্ন ঃ সূর্য পরিবর্তিত হওয়ার কি অর্থ ?

উত্তর ঃ যখন সূর্য লাল টিকিয়ার মত হয়ে যায় এবং তাতে চোখ ধরা সম্ভব হয়, তখন বুঝতে হবে সূর্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

তারাবীহ্‌র নামাযের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ তরাবীহ্‌র নামায সুন্নত নাকি নফল ?

উত্তর ঃ তারাবীহ্‌র নামায পুরুষ ও মহিলা সবার জন্যই সুন্নতে মুআক্কাদা। আর জামাআতে পড়া হল সুন্নতে কেফায়া। অর্থাৎ, যদি পাড়ার মসজিদে তারাবীহ্‌র জামাআত পড়া হয় এবং কেউ যদি বাড়িতে একা পড়ে নেয়, তবে গোনাহ্‌গার হবে না। কিন্তু পাড়ার কেউ যদি জামাআতে না পড়ে, তাহলে সবাই গোনাহ্‌গার হবে।

প্রশ্ন ঃ তারাবীহ্‌র নামাযের সময় কখন ?

উত্তর ঃ তারাবীহ্‌র নামাযের সময় এশার নামাযের পর থেকে ফজর পর্যন্ত। বিত্‌র নামাযের আগেও এবং পরেও তারাবীহ্‌র সময়। তবে বিত্‌রের নামাযের আগেই তারাবীহ্ পড়া উচিত। অবশ্য যদি কারো তারাবীহ্ নামাযের কিছু রাকআত রয়ে গিয়ে থাকে এবং ইমাম বিত্‌র পড়া শুরু করে দেন, আর সে লোক ইমামের সাথে বিত্‌রে শরীক হয়ে যায় এবং বিত্‌রের পর নিজের রয়ে যাওয়া তারাবীহ্‌র রাকআতগুলো পড়ে নেয় তবে জায়েয হবে।

প্রশ্ন ঃ তারাবীহ্‌র নামায কত রাকআত ? তার সংখ্যা ও অবস্থা কি ?

উত্তর ঃ কুড়ি রাকআত দশ সালামে পড়া সুন্নত। অর্থাৎ, দু' দু' রাকআতের নিয়ত করবে এবং প্রত্যেক তারবীহ্ (অর্থাৎ, চার রাকআত)-এর পরে সামান্য সময় আরাম করে নেয়া মুস্তাহাব।

প্রশ্ন ঃ আরাম করার জন্য যতটা সময় বসবে তাতে চুপ করে থাকবে, নাকি কিছু পড়তে হবে ?

উত্তর ঃ তা ইচ্ছা, চুপ করেও বসে থাকতে পারে কিংবা (আস্তে আস্তে) কোরআন পাঠ করতে অথবা তসবীহ পড়তে অথবা একা একা নফলও পড়তে পারে।

প্রশ্ন ঃ তারাবীহ্‌র নামাযে কোরআন মজীদ খতম করা কি ?

উত্তর ঃ সারা মাসে একবার কোরআন মজীদ খতম করা সুন্নত। আর দু'বার খতম করা উত্তম এবং তিনবার খতম করা তার চেয়েও উত্তম। কিন্তু দু'তিনবার খতম করা তখনই উত্তম হবে, যখন মুক্তাদীদের জন্য দুষ্কর না হবে। তবে একবার খতমের ব্যাপারে মানুষের ক্লান্তির প্রতি লক্ষ্য করা নিষ্প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ তারাবীহ্‌র নামায বসে বসে পড়া কি ?

উত্তর ঃ দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকলে বসে বসে তারাবীহ্ পড়া মাকরূহ।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন লোক রাকআতের শুরুতে শরীক হয় না, যখন ইমাম সাহেব রুকূতে যেতে থাকেন, তখন শরীক হয়। বিষয়টি কেমন ?

উত্তর ঃ এটা মাকরূহ। রাকআতের শুরুতেই শরীক হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি ফরযের জামাআত না পেয়ে থাকে, তবে তার জন্য একা ফরয পড়ে তারাবীহ্‌র জামাআতে শরীক হওয়া জায়েয কিনা ?

উত্তর ঃ জায়েয।

নামাযের কাযা পড়ার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ 'আদা ও 'কাযা' কাকে বলে ?

উত্তর ঃ কোন এবাদতকে তার নির্দিষ্ট সময় সম্পাদন করে নেয়াকে আদা বলা হয় এবং কাযা বলা হয়, কোন ফরয কিংবা ওয়াজিবকে তার নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পর সম্পাদন করাকে। যেমন, যোহরের নামায যোহরের সময় পড়ে ফেললে তাকে 'আদা' বলা হবে, আর যোহরের সময় চলে যাবার পর পড়লে তা 'কাযায়' গণ্য হবে।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ নামাযের কাযা ওয়াজিব হয় ?

উত্তর ঃ সমস্ত ফরয নামাযের কাযা ফরয এবং ওয়াজিব নামাযের কাযা ওয়াজিব। আর কোন কোন সুন্নত নামাযের কাযা সুন্নত।

প্রশ্ন ঃ কোন ফরয কিংবা ওয়াজিব সময় মত আদায় না করা এবং কাযা করে দেয়া কি ?

উত্তর ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং বিনা ওযরে কোন ফরয কিংবা ওয়াজিব অথবা সুন্নতে মুআক্কাদা সময় মত আদায় না করা পাপ। ফরয ও ওয়াজিব সময় মত আদায় না করার পাপ বিরাট, তারপর সুন্নতের।

তবে যদি অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাযা হয়ে যায়, যেমন নামায পড়ার কথা ভুলে গেল কিংবা নামাযের সময় ঘুম ভাঙ্গলো না, তাহ্লে গোনাহ্ হবে না।

প্রশ্ন ঃ ফরয কিংবা ওয়াজিব কাযা হয়ে গেলে তা কোন্ সময় পড়া উচিত ?

উত্তর ঃ যখন মনে হয় কিংবা ঘুম ভাঙ্গে তৎক্ষণাৎ পড়ে ফেলবে; দেরী করলে গোনাহ্ হবে। তবে যদি মাকরূহ সময় স্মরণ হয় কিংবা ঘুম ভাঙ্গে তাহ্লে মাকরূহ্ সময় চলে যাবার পর পড়বে।

প্রশ্ন ঃ কাযা নামাযের নিয়ত কিভাবে করতে হবে ?

উত্তর ঃ কাযা নামাযের নিয়ত এভাবে করবে যে, আমি অমুক দিনের ফজর কিংবা যোহরের নামাযের কাযা পড়ছি। শুধু এ নিয়ত করে নেয়া যে, ফজর কিংবা যোহরের কাযা পড়ছি, যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ঃ কারো উপর যদি বহু নামায কাযা থাকে এবং তার দিন মনে না থাকে, যেমন, সে মাস-দু'মাস একেবারে নামায পড়েইনি কিন্তু একথা জানা আছে যে, আমার উপর ত্রিশ ওয়াক্তের ফজর এবং একই পরিমাণ যোহরের নামায কাযা রয়েছে; কিন্তু তার মাস মনে নেই যে, কোন্ মাসের নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল, তখন কিভাবে নিয়ত করবে ?

উত্তর ঃ এমতাবস্থায় যখন কোন নামায যেমন, ফজরের কাযা করতে হলে এভাবে নিয়ত করবে যে, আমার উপর যে পরিমাণ ফজরের নামায বাকী রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে থেকে প্রথম ফজর নামাযের কাযা পড়ছি অথবা শেষ ফজরের কাযা পড়ছি। এমনিভাবে যে নামাযের কাযা পড়বে, তার নিয়ত এ নিয়মে করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ কাযা নামায মসজিদে পড়া উত্তম নাকি বাড়ীতে ?

উত্তর ঃ একা কোন লোকের নামায কাযা হলে বাড়ীতে পড়া উত্তম। আর মসজিদে পড়লেও দোষ নেই। কিন্তু কারো সাথে একথা বলবে না যে, আমি এটি কাযা নামায পড়লাম। কারণ, নিজের কাযা নামাযের কথা অন্যকে বলা মাকরূহ।

প্রশ্ন ঃ সেসব সুন্নত কোন্গুলো, যার কাযা পড়া সুন্নত ?

উত্তর ঃ ফরযসহ ফজরের সুন্নত কাযা হয়ে গেলে দুপুরের পূর্বে তা-ও ফরযের সাথে কাযা করে নেয়া উচিত। দুপুরের পরে পড়লে শুধু ফরয পড়বে।

আর যদি শুধু সুন্নত বাদ পড়ে থাকে, তবে সুন্নতের কাযা নেই। সূর্যোদয়ের আগে তা পড়লে মাকরূহ হবে আর সূর্যোদয়ের পরে পড়লে মাকরূহ হবে না; কিন্তু তা সুন্নত হবে না; বরং নফল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ যোহরের প্রথম চার রাকআত সুন্নত যদি ফরযের আগে পড়া না যায়, তবে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ যোহর জুমুআর সুন্নত যদি ফরযের আগে পড়া না হয়, তবে ফরযের পরে পড়ে নেবে। তা ফরযের পরের সুন্নতের আগে বা পরে দু'ভাবেই পড়ার অবকাশ রয়েছে। তবে পরের সুন্নতের পরে পড়াই উত্তম।

মুদরিক, মসবূক ও লাহিক-এর বিবরণ

প্রশ্ন ঃ মুদরিক কাকে বলে ?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে পুরো নামায পেয়েছে, অর্থাৎ, প্রথম রাকআত থেকে শরীক হয়ে শেষ পর্যন্ত সাথে থেকেছে, তাকে মুদরিক বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ মসবূক কাকে বলে ?

উত্তর ঃ মসবূক এমন লোককে বলা হয়, যে ইমামের সাথে প্রথম থেকে দু'এক রাকআত পায়নি।

প্রশ্ন ঃ লাহিক কাকে বলে ?

উত্তর ঃ লাহিক হল সে ব্যক্তি, যার ইমাম সাহেবের সাথে শরীক হওয়ার পর দু'এক রাকআত চলে গেছে। যেমন, এক ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযে শরীক হল কিন্তু কা'দায় বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ল এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাতে রইল যে, ইমাম সাহেব দু'এক রাকআত আরো পড়ে নিলেন।

প্রশ্ন ঃ মসবূক তার ছুটে যাওয়া নামায কখন এবং কিভাবে পূর্ণ করবে ?

উত্তর ঃ ইমামের সাথে নামাযের শেষ পর্যন্ত শরীক থাকবে, যখন তিনি সালাম ফেরাবেন, তখন তার সাথে সে সালাম ফেরাবে না; বরং দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো পূর্ণ করবে এমনভাবে, যেন সে এখনি নামায শুরু করল। যেমন, তার শুধু এক রাকআত বাদ পড়ে থাকলে ইমামের সালামের পর সে এভাবে পড়বে যে, প্রথমে সানা, আউযুবিল্লাহ, ও বিস্‌মিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহা পড়বে অতঃপর অন্য কোন সূরা যোগ করবে। তারপর যথারীতি রাকআত পূর্ণ করে কা'দা করবে এবং সালাম ফেরাবে। নামাযের প্রত্যেক বাদ পড়ে যাওয়া রাকআত পূরণ করার এটাই নিয়ম।

আর যখন কারো যোহর, আসর, এশা কিংবা ফজরের দু'রাকআত বাদ পড়ে যাবে, তখন প্রথম রাকআতে সানা, তাআউয, তাসমিয়া, সূরা ফাতেহা ও অন্য

সূরা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা পড়ে রুকূ সজদা ও কা'দা করে সালাম ফেরাবে। আর যদি যোহর বা আসরের কিংবা এশার শুধু এক রাকআত ইমামের সাথে পাওয়া যায়, তবে তিন রাকআত এভাবে পড়বে যে, প্রথম রাকআত ফাতেহা ও সূরাসহ পড়ে কা'দা করবে এবং তারপর এক রাকআত ফাতেহা ও সূরাসহ পড়বে। তারপর এক রাকআতে শুধু ফাতেহা পড়ে রাকআত পূর্ণ করবে এবং সালাম ফেরাবে। আর যদি মাগরিবের নামাযের এক রাকআত ইমামের সাথে পাওয়া যায়, তবে এক রাকআত ফাতেহা ও সূরার সাথে পড়ে কা'দা করবে। তারপর দ্বিতীয় রাকআতও ফাতেহা ও সূরাসহ পড়ে কা'দা করে সালাম ফেরাবে। এক কথায় নামাযের শুধু এক রাকআত ইমামের সাথে পেলে নিজের নামাযে এক রাকআতের পর কা'দা করা উচিত, তা যে কোন ওয়াক্তের নামাযই হোক।

প্রশ্ন ঃ মসবূক যদি ইমামের সালাম ফেরাবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে যায় আর ইমাম সজদায়ে সহু করেন, তখন মসবূক কি করবে?

উত্তর ঃ ফিরে আসবে এবং ইমামের সাথে সজদায়ে সহুতে শরীক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ মসবূক যদি ভুলবশত ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তাহলে কি হুকুম?

উত্তর ঃ যদি ইমামের সালামের পূর্বে কিংবা ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে সালাম ফিরিয়ে থাকে, তবে তার উপর সজদায়ে সহু হবে না, নামায পূর্ণ করে নেবে। আর ইমামের সালামের পরে যদি সালাম ফিরিয়ে থাকে, তাহলে নিজের নামায শেষে সজদায়ে সহু করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ লাহিক তার বাদ পড়া নামায কখন কিভাবে পূর্ণ করবে?

উত্তর ঃ লাহিকের যেসব রাকআত কোন ওযরবশত যেমন, ঘুমিয়ে পড়ার কারণে বাদ পড়ে গেল, তখন সে জেগে উঠার সাথে সাথে ইমামের সঙ্গ ত্যাগ করে নিজের বাদ পড়া নামায পড়ে নেবে। আর তা এমনভাবে পড়বে যেন ইমামেরই সাথে পড়ছে অর্থাৎ, কেরাআত পড়বে না। যখন বাদ পড়া নামায পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন ইমামের সাথে বাকী নামায পূর্ণ করবে। আর ইমাম যদি ইতিমধ্যে নামায শেষ করে ফেলেন, তাহলে বাকী নামাযও তেমনিভাবে পূরণ করবে, যেন ইমামের পেছনে পড়ছে। এ অবস্থায় তার কোন ভুল হয়ে গেলে সজদায়ে সহুও করবে না। কারণ, তখনও সে মুক্তাদীই রয়েছে। আর মুক্তাদীর ভুলের জন্য সজদায়ে সহু হয় না।

সজদায়ে সহুর বিবরণ

প্রশ্ন ঃ সজদায়ে সহু কাকে বলে ?

উত্তর ঃ সহু অর্থ হল ভুলে যাওয়া। ভুলবশত কখনও কখনও নামায বেশকম হয়ে ক্ষতি হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষতি এমন হয় যে, সেগুলো অপসারণ করার জন্য নামাযের শেষ বৈঠকে দু'টি সজদা করা হয়। এ সজদাকেই সজদায়ে সহু বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ সজদায়ে সহু কিভাবে করা হয়?

উত্তর ঃ শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পর এক দিকে সালাম ফিরিয়ে তাকবীর বলে সজদা করবে। সজদায় তিন তসবীহ পাঠ করবে এবং তাকবীর বলে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে আবার তাকবীর বলতে বলতে দ্বিতীয় সজদা করবে এবং আবার তাকবীর বলে মাথা তুলে বসবে এবং পুনরায় আত্তাহিয়্যাত, দুরূদ ও দো'আ পড়ে উভয় দিকে সালাম ফেরাবে।

প্রশ্ন ঃ যদি সজদায়ে সহুর সালামের পূর্বে আত্তাহিয়্যাতের পর দুরূদ ও দো'আও পড়ে নেয়, তবে কেমন হবে ?

উত্তর ঃ কোন কোন আলেম সতর্কতা হিসাবে এটি পছন্দ করেছেন যে, সজদায়ে সহুর পূর্বেও তাশাহ্হুদ, দুরূদ ও দো'আ পড়বে এবং সজদায়ে সহুর পরেও তিনোটি পড়বে। কাজেই পড়ে নেয়াই ভাল। তবে না পড়লেও কোন ক্ষতি নেই।

প্রশ্ন ঃ সজদায়ে সহু কি শুধু ফরয নামাযে ওয়াজিব নাকি সমস্ত নামাযেই ?

উত্তর ঃ সমস্ত নামাযেই সজদায়ে সহুর হুকুম এক রকম।

প্রশ্ন ঃ এক দিকেও সালাম না ফিরিয়ে সজদায়ে সহু করে ফেললে তার কি হুকুম ?

উত্তর ঃ নামায হয়ে যাবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত এমন করা মাকরূহে তান্‌যীহী।

প্রশ্ন ঃ দু'দিকে সালাম ফেরাবার পর সজদায়ে সহু করলে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ একটি রেওয়ায়ত অনুযায়ী জায়েয। কিন্তু প্রবল মত হল এই যে, এক দিকেই সালাম ফেরাবে; যদি দু'দিকে সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তবে সজদায়ে সহু করবে না; বরং নামাযই পুনরায় পড়বে।

প্রশ্ন ঃ কি কি কারণে সজদায়ে সহু ওয়াজিব হয় ?

উত্তর ঃ (১) কোন ওয়াজিব বাদ পড়ে গেলে, (২) ওয়াজিব আদায়ে বিলম্ব ঘটলে, (৩) কোন ফরয আদায়ে বিলম্ব ঘটলে, (৪) কোন ফরয আগে পড়ে ফেললে, (৫) কিংবা কোন ফরযের পুনরাবৃত্তি ঘটলে। যেমন,

দু'টি রুকূ করে নিলে কিংবা কোন ওয়াজিবের অবস্থা বদলে দিলে সজদায়ে সহু ওয়াজিব হয়।

প্রশ্ন ঃ যেসব বিষয় ভুলবশত করলে সজদায়ে সহু ওয়াজিব হয় সেগুলো যদি ইচ্ছাকৃত করা হয়, তবে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ ইচ্ছাকৃত করলে সজদায়ে সহুর দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয় না; বরং নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ একই নামাযে যদি কয়েকটি বিষয় এমন হয়ে যায়, যার প্রত্যেকটির দরুন সজদায়ে সহু ওয়াজিব হয়, তাহলে কয়টি সজদা করতে হবে ?

উত্তর ঃ শুধু একবার দু'টি সজদায়ে সহু করাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন ঃ কেরাআতে কি কি বিষয় পরিবর্তিত হয়ে গেলে সজদায়ে সহু ওয়াজিব হয় ?

উত্তর ঃ (১) ফরয নামাযের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় রাকআতে অথবা উভয় রাকআতে এবং ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল নামাযের যে কোন এক বা একাধিক রাকআতে সূরা ফাতেহা বাদ পড়ে গেলে, (২) উল্লিখিত রাকআতসমূহে পুরো সূরা ফাতেহা কিংবা তার বেশীর ভাগ অংশের পুনরাবৃত্তি ঘটলে, (৩) সূরা ফাতেহার পূর্বে অন্য সূরা পড়ে ফেললে এবং (৪) ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত ছাড়া (ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল) যে কোন নামাযের কোন রাকআতে সূরা বাদ পড়ে গেলে সজদায়ে সহু ওয়াজিব হয়। তবে শর্ত হল এই যে, এ সবই ভুলবশত হতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ভুলবশত যদি তা'দীলে আরকান (রুকনের ধারাবাহিকতা) না করে, তবে সজদায়ে সহু ওয়াজিব হবে কিনা ?

উত্তর ঃ সজদায়ে সহু ওয়াজিব হবে।

প্রশ্ন ঃ যদি প্রথম বৈঠক ভুলে যায়, তবে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ যদি ভুলবশত উঠতে আরম্ভ করে, তবে যে পর্যন্ত বসার কাছাকাছি থাকবে, বসে যাবে এবং সজদায়ে সহু করবে না। আর যদি দাঁড়ানোর কাছাকাছি চলে যায়, তবে বৈঠক বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং নামায শেষে সজদায়ে সহু করে নেবে। তাতেই নামায হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ আর কোন্ কোন্ কারণে সজদায়ে সহু ওয়াজিব হয় ?

উত্তর ঃ (১) রুকূর পুনরাবৃত্তিতে। অর্থাৎ, দু'বার করে ফেললে, (২) তিন সজদা করে ফেললে, (৩) প্রথম বৈঠক কিংবা দ্বিতীয় বৈঠকে তাশাহ্হুদ রয়ে

গেলে, (৪) প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ পরিমাণ দুরূদ পড়লে কিংবা এতটা সময় বসে থাকলে, (৫) জেহরী নামাযে ইমামের আস্তে পড়াতে এবং (৬) সেররী নামাযে ইমামের জেহর করলে সজদায়ে সহু ওয়াজিব হয়, যখন এসব বিষয় ভুলবশত হয়।

প্রশ্ন ঃ ইমামের পেছনে মুক্তাদীর কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেলে কি করতে হবে ?

উত্তর ঃ মুক্তাদীর নিজের ভুলের কারণে সজদায়ে সহু ওয়াজিব হয় না।

প্রশ্ন ঃ মসবূক নিজের বাকী নামায পূর্ণ করতে গিয়ে ভুল হলে কি করবে ?

উত্তর ঃ এমতাবস্থায় নিজের নামাযের শেষ বৈঠকে সজদায়ে সহু করা তার উপর ওয়াজিব।

সজদায়ে তেলাওয়াতের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ সজদায়ে তেলাওয়াত কাকে বলে ?

উত্তর ঃ তেলাওয়াত অর্থ পাঠ করা। কোরআন মজীদে এমন কিছু জায়গা রয়েছে, যেগুলো পাঠ করলে কিংবা কাউকে পাঠ করতে শুনলে সজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এ সজদাকেই সজদায়ে তেলাওয়াত বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ এমন জায়গা কতটি যা পড়লে কিংবা শুনলে সজদা করতে হয় ?

উত্তর ঃ সারা কোরআন মজীদে চৌদ্দটি জায়গা রয়েছে। সেগুলোকে চৌদ্দ সজদাও বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ নামাযের বাইরে যদি সজদার আয়াত পড়ে, তবে কখন ও কিভাবে সজদা করবে ?

উত্তর ঃ যখন সজদার আয়াত পড়বে ঠিক তখনই সজদা করে ফেলা উত্তম। কিন্তু যদি তখন না করে,তাতেও কোন গোনাহ্ নেই। তবে বেশী দেরী করা মাকরূহ।

আর নামাযের বাইরে সজদা করার উত্তম নিয়ম হল এই যে, দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতে বলতে সজদা করবে এবং আবার তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু বসা অবস্থায়ই যদি সজদায় চলে যায় এবং সজদা থেকে উঠেও বসেই থাকে, তাতেও সজদা আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ সজদায়ে তেলাওয়াত করার জন্য শর্ত কি ?

উত্তর ঃ নামাযের শর্তসমূহই সজদায়ে তেলাওয়াতের শর্ত। অর্থাৎ, (১) শরীর, (২) কাপড় ও (৩) স্থান পাক হতে হবে, (৪) সতর আবৃত থাকতে

হবে, (৫) কেবলামুখী হতে হবে এবং (৬) সজদায়ে তেলাওয়াতের নিয়ত করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ কি কি কারণে সজদায়ে তেলাওয়াত বাতিল হয়ে যায়?

উত্তর ঃ যেসব কারণে নামায বাতিল হয়ে যায়, সেসব কারণেই সজদায়ে তেলাওয়াত বাতিল হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ যদি সজদার কোন বিশেষ আয়াত দুই বা তার চেয়ে বেশী বার পড়া হয়, তবে তার কি হুকুম ?

উত্তর ঃ যদি সজদার কোন বিশেষ আয়াত দুই বা ততোধিক বার একই মজলিসে (বৈঠকে) পড়ে বা শুনে, তবে একটি সজদাই ওয়াজিব হয়।

প্রশ্ন ঃ এক বৈঠকে যদি সজদার দু'টি আয়াত পড়ে কিংবা একটি আয়াত দুই মজলিসে (বৈঠকে) পড়ে, তবে কি হুকুম ?

উত্তর ঃ এক বৈঠকে সজদার যত আয়াত পড়বে কিংবা একই আয়াত যত বৈঠকে পড়বে, তত সজদাই ওয়াজিব হবে।

প্রশ্ন ঃ যদি কোন লোক কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করার সময় আগে পিছে থেকে পড়ে নেয় এবং শুধু সজদার আয়াতগুলি ছেড়ে দেয়, তবে তা কেমন ?

উত্তর ঃ এমন করা মাকরূহ।

প্রশ্ন ঃ তেলাওয়াতকারী যদি এমন জায়গায় তেলাওয়াত করতে থাকে যে, সেখানে অন্য লোকও বসে থাকে, তখন যদি সে সজদার আয়াতগুলো আস্তে পড়ে নেয় যাতে লোকেরা না শুনে, তবে তা কেমন হবে ?

উত্তর ঃ জায়েয; বরং আস্তে পড়াটাই উত্তম।

রুগ্ন ব্যক্তির নামাযের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ রুগ্ন বা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য কোন্ অবস্থায় বসে নামায পড়া জায়েয ?

উত্তর ঃ রোগীর যখন দাঁড়াবার ক্ষমতা আদৌ না থাকে কিংবা দাঁড়াতে গেলে ভীষণ কষ্ট হয় অথবা রোগ বেড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে কিংবা মাথা ঘুরে পড়ে যাবার ভয় হয় অথবা দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকলেও রুকূ-সজদা করতে পারে না, তখন এ সব অবস্থায় বসে বসে নামায পড়া জায়েয। অনন্তর যদি রুকূ-সজদা করতে পারে, তবে রুকূ-সজদার সাথে এবং রুকূ-সজদা করতে না পারলে, রুকূ-সজদার ইশারার দ্বারা নামায

পড়বে। রুকূ-সজদার ইশারা মাথা নুইয়ে করবে। আর রুকূর ইশারা অপেক্ষা সজদার ইশারায় মাথা কিছুটা বেশী নোয়াবে।

প্রশ্ন ঃ কোন লোক যদি সম্পূর্ণ কিয়াম না করতে পারে, অর্থাৎ, অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়াতে পারে, তাকে কি করতে হবে ?

উত্তর ঃ তার উপর ততটুকু দাঁড়ানোই জরুরী।

প্রশ্ন ঃ রোগীর যদি বসে নামায পড়ার শক্তিও না থাকে, তাহলে কি করবে ?

উত্তর ঃ শুয়ে শুয়ে নামায পড়ে নেবে। শুয়ে নামায পড়ার উপায় এই যে, চিত হয়ে শুবে এবং পা কেবলার দিকে রাখবে। কিন্তু ছড়িয়ে রাখা উচিত নয়। হাঁটু খাড়া করে রাখবে এবং মাথার নীচে বালিশ প্রভৃতি দিয়ে সামান্য উঁচু করে নেবে এবং রুকূ-সজদার জন্য মাথা নুইয়ে ইশারায় নামায পড়বে। এ উপায়টিই উত্তম। তবে উত্তর দিকে মাথা রেখে ডান কাতে কিংবা দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে বাম কাতে শুয়ে ইশারা করে নামায পড়াও জায়েয। শেষোক্ত দু'টি উপায়ের মধ্যে ডান কাতে শোয়া উত্তম।

প্রশ্ন ঃ রোগীর যদি মাথায় ইশারা করার শক্তিও না থাকে, তবে কি হুকুম ?

উত্তর ঃ যখন মাথায়ও ইশারা করতে পারবে না, তখন নামায বিলম্বিত করবে। তারপর যদি এক রাত এক দিনের বেশী তার এ অবস্থা থাকে, তাহলে ছুটে যাওয়া নামাযের কাযাও তাকে করতে হবে না। অবশ্য যদি এক রাত এক দিনের কিংবা তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে মাথায় ইশারা করার শক্তি ফিরে পায়, তবে ছুটে যাওয়া নামাযগুলোর (যা পাঁচ বা তার কম হবে) কাযা তার উপর জরুরী হবে।

মুসাফিরের নামাযের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কতটা দূরের সফরের ইচ্ছা করলে মানুষ মুসাফির হয় ?

উত্তর ঃ শরীঅতে মুসাফির সে লোককে বলা হয়, যে এতটা দূরে যাবার ইচ্ছা করে বের হয়, যেখানে তিন দিনে পৌঁছাতে পারে। তিন দিনে পৌঁছানো বলতে একথা বুঝাবে না যে, ক্রমাগত সারা দিন চলে তিন দিনে যেখানে পৌঁছাতে হবে; বরং প্রতিদিন ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত চলা গ্রহণযোগ্য এবং চলা বলতে মধ্যম ধরনের চলা আর দিন বলতে সবচেয়ে ছোট দিন বুঝাবে।

প্রশ্ন ঃ মধ্যম ধরনের চলা বলতে কি বুঝায় ? এবং তিন দিনের দূরত্ব কত মাইল ?

উত্তর ঃ মধ্যম ধরনের চলা বলতে পদাতিক ব্যক্তির চলা উদ্দেশ্য। আর যথার্থ কথা হল এই যে, তিন মঞ্জিল দূরত্বই ধর্তব্য। কিন্তু সহজ করার জন্য ৪৮ মাইলের ব্যবধানকেই তিন মঞ্জিল ধরে নেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কোন লোক যদি রেল, ঘোড়াগাড়ি কিম্বা মোটর বাসে করে এতটা দূরত্বের মনস্থ করে রওয়ানা হয়, যেখানে পদব্রজে তিন দিনে পৌঁছাতে হয়, তবে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ সে মুসাফির হয়ে যাবে, তা যত দ্রুতই সেখানে পৌঁছে থাক।

প্রশ্ন ঃ মুসাফিরের নামাযে কি পার্থক্য ?

উত্তর ঃ মুসাফির যোহর, আসর ও এশার নামায চার রাকআতের জায়গায় দু'রাকআত পড়ে; কিন্তু ফজর, মাগরিব ও বিত্‌র একই থাকে। তাতে কোন পার্থক্য হয় না।

প্রশ্ন ঃ চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের দু'রাকআত পড়াকে কি বলে ?

উত্তর ঃ তাকে 'কসর' বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ মুসাফির কখন থেকে কসর শুরু করবে ?

উত্তর ঃ যখন নিজ জনপদের বসতি এলাকা ছেড়ে যাবে, তখন থেকেই কসর করতে থাকবে।

প্রশ্ন ঃ মুসাফির কতকাল পর্যন্ত কসর করবে ?

উত্তর ঃ যতকাল পর্যন্ত সফরে থাকবে এবং কোন শহরে, জনপদে বা গ্রামে পৌঁছে সেখানে পনের দিন অবস্থানের নিয়ত না করবে, ততকাল নামাযে কসর করতে থাকবে। আর যখনই কোথাও পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করে নেবে, তখন নিয়ত করার সাথে সাথে পুরো নামায পড়তে শুরু করবে।

প্রশ্ন ঃ যদি কোথাও দু'চার দিন থাকার নিয়ত ছিল; কিন্তু কাজ শেষ হল না। আবার দু'চার দিনের নিয়ত করল। তাতেও কাজ শেষ হল না এবং আবারও দু'চার দিনের নিয়ত করল। এমনিভাবে পনের দিনের বেশী কেটে গেলে তখন কি হুকুম ?

উত্তর ঃ যে পর্যন্ত একত্রে পনের দিনের নিয়ত না করবে, নামায কসর করা কর্তব্য। এমনি অবস্থায় পনের দিনের বেশী হয়ে গেলেও কোন ক্ষতি নেই।

প্রশ্ন ঃ মুসাফির যদি চার রাকআতবিশিষ্ট নামায পুরোই পড়ে ফেলে, তবে কি হুকুম ?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় রাকআতে কা'দা (বৈঠক) করে থাকলে শেষে সজদায়ে সহু করে নিলেই নামায হয়ে যাবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এমন করলে গোনাহ্গার হবে। আর ভুলবশত এমন হয়ে গেলে তাতে গোনাহ্ও নেই। এমতাবস্থায় দু'রাকআত ফরয এবং দু'রাকআত নফল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় রাকআতে বৈঠক করে না থাকে, তবে ফরয নামায আদায় হবে না; চার রাকআতই নফল হয়ে যাবে। ফরয পুনরায় পড়তে হবে।

প্রশ্ন ঃ যদি মুসাফির মুকীমের পেছনে নামায পড়ে, তবে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ মুকীম ইমামের পেছনে একতেদা করলে মুসাফির মুক্তাদীর উপরও চার রাকআতই ফরয হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ যদি ইমাম মুসাফির হয় এবং মুক্তাদী মুকীম হয়, তবে তার কি হুকুম ?

উত্তর ঃ মুসাফির নিজের দু'রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলবে এবং সালাম ফেরাবার পর মুক্তাদীদেরকে বলে দেবে যে, তোমরা নিজেদের নামায পুরো করে নাও; আমি মুসাফির। মুক্তাদীরা সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং নিজ নিজ নামায পূর্ণ করবে। কিন্তু এ দু'রাকআতে ফাতেহা ও সূরা পড়বে না। আর যদি এরই মধ্যে কোন ভুল হয়ে যায়, তবে সজদায়ে সহুও করবে না।

প্রশ্ন ঃ চলন্ত রেল ও জাহাজে নামায জায়েয কিনা ?

উত্তর ঃ চলন্ত রেল ও জাহাজে নামায জায়েয যদি দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। মাথা ঘুরে পড়ে যাবার ভয় না থাকলে দাঁড়িয়ে পড়া জরুরী। আর যদি দাঁড়িয়ে পড়তে না পারে, তবে বসে বসে পড়ে নেবে। আর যদি নামাযের মাঝে রেল কিংবা জাহাজ ঘুরে যাবার দরুন নামাযীর মুখ কেবলার দিকে না থাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কেবলার দিকে ঘুরে যাওয়া উচিত। অন্যথায় নামায হবে না।

জুমুআর নামাযের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ জুমুআর নামায ফরয, ওয়াজিব, না সুন্নত ?

উত্তর ঃ জুমুআর নামায ফরয। বরং যোহরের নামাযের চেয়েও এর তাকীদ বেশী। জুমুআর দিনে যোহরের নামায নেই। জুমুআর নামাযকেই তার স্থলাভিষিক্ত করে দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ জুমুআর নামায কি প্রত্যেক মুসলমানের উপরই ফরয ?

উত্তর ঃ জুমুআর নামায স্বাধীন, সাবালক, বুদ্ধিমান, সুস্থ ও মুকীম পুরুষদের উপর ফরয। সুতরাং নাবালেগ শিশু, ক্রীতদাস, পাগল, অসুস্থ, অন্ধ, পঙ্গু ও এমনি ধরনের ওযরবিশিষ্ট লোক এবং মুসাফির ও মহিলাদের উপর জুমুআর নামায ফরয নয়।

প্রশ্ন ঃ যদি মুসাফির, অন্ধ, পঙ্গু, কিংবা মহিলারা জুমুআর নামাযে শরীক হয়ে যায়, তবে তাদের নামায শুদ্ধ হবে কিনা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং যোহরের নামায তাদের উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ জুমুআর নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ কি কি ?

উত্তর ঃ জুমুআর নামায শুদ্ধ হওয়ার বেশ কতিপয় শর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ, শহর কিংবা শহরের সমপর্যায়ের স্থান–বড় গ্রাম বা জনপদ হতে হবে। এমনিভাবে শহরের আশপাশের এমন জনপদ যার সাথে শহরের প্রয়োজনাদি সম্পৃক্ত। যেমন শহরের মৃতদের যেখানে দাফন করা হয়। সেনানিবাসও শহরের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। ছোট গ্রামে জুমুআ জায়েয নয়। দ্বিতীয় শর্ত, যোহরের সময় হওয়া। তৃতীয় শর্ত, নামাযের পূর্বে খুতবা পড়া। চতুর্থ শর্ত, জামাআত এবং পঞ্চম শর্ত 'ইযনে আম' তথা সাধারণ অনুমতি। এ পাঁচটি শর্ত পাওয়া গেলেই জুমুআর নামায শুদ্ধ হবে।

প্রশ্ন ঃ খুতবা পড়ার সুন্নত নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ নামাযের পূর্বে ইমাম মিম্বরের উপর বসবেন এবং তার সামনে মুআয্যিন আযান দিবেন। আযান শেষ হলে ইমাম নামাযীদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে খুতবা পড়বেন। প্রথম খুতবা পড়ে সামান্য সময় বসবেন এবং পুনরায় দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুতবা পড়বেন। তারপর যখন দ্বিতীয় খুতবা শেষ হবে, তখন ইমাম সাহেব মিম্বর থেকে নেমে মেহরাবের সামনে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং মুআয্যিন তাকবীর বলবেন। অতঃপর উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে ইমামের সাথে নামায আদায় করবেন।

প্রশ্ন ঃ খুতবার আযান কোথায় হওয়া উচিত ?

উত্তর ঃ খতীবের সামনে হওয়া উচিত। তা সেটা মিম্বরের কাছেই হোক কিংবা দু'এক কাতার পরে অথবা সমস্ত কাতারের পরে হোক। মসজিদের ভেতরে হোক অথবা বাইরে হোক। সবরকমই জায়েয।

প্রশ্ন ঃ খুতবা উর্দু, (বাংলা বা অন্য কোন) ভাষায় পড়া কিংবা অন্য ভাষার কবিতা খুতবার ভেতরে পড়া কেমন ?

উত্তর ঃ আরবী ভাষা ছাড়া যে কোন ভাষায় খুতবা দেয়া মাকরূহ। কিন্তু তাতে খুতবার ফরয আদায় হয়ে যায়। অবশ্য সওয়াবে ক্ষতি এসে যায়।

প্রশ্ন ঃ খুতবা চলাকালে কোন্ কোন্ কাজ নাজায়েয ?

উত্তর ঃ (১) কথাবার্তা বলা, (২) সুন্নত কিংবা নফল নামায শুরু করা, (৩) খাওয়া, (৪) পান করা, (৫) কোন কথার জওয়াব দেয়া এবং (৬) কোরআন মজীদ ইত্যাদি পড়া। এক কথায় যে কোন কাজ খুতবা শুনতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তা সবই মাকরূহ। যখন ইমাম সাহেব খুতবা পড়ার উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করেন, তখন থেকেই এগুলো মাকরূহ।

প্রশ্ন ঃ জুমুআর নামাযের জন্য জামাআত শর্ত হওয়ার অর্থ কি ?

উত্তর ঃ জুমুআর নামাযে ইমাম ছাড়া কম-সে-কম তিনজন লোক হওয়া জরুরী, তিনজন না হলে জুমুআর নামায শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন ঃ 'ইয্‌নে আম' বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ ইয্‌ন অর্থ হল অনুমতি। আর 'ইয্‌নে আম' হল সবার জন্য অনুমতি; যার ইচ্ছা সেই যেন এসে নামাযে শরীক হতে পারে। এমন জায়গায় জুমুআর নামায জায়েয নয়, যেখানে শুধু বিশেষ বিশেষ লোকেরা আসতে পারে; প্রত্যেকে আসার অনুমতি থাকে না।

প্রশ্ন ঃ জুমুআর ফরয নামায কত রাকআত ?

উত্তর ঃ দু'রাকআত। নামাযের শুরু থেকেই কেউ শরীক হোক বা এক রাকআতে কিংবা শেষ বৈঠকে, দু'রাকআতই পূরণ করে নেবে।

দুই ঈদের নামাযের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ ঈদের দিন কি কি কাজ সুন্নত বা মুস্তাহাব ?

উত্তর ঃ (১) গোসল ও মেসওয়াক করা, (২) নিজের পোশাকের মধ্য থেকে সর্বোত্তম পোশাকটি পরা, (৩) সুগন্ধী লাগানো এবং (৪) ঈদুল ফিৎরের জামাআতে রওয়ানা হবার পূর্বে খেজুর কিংবা কোন মিষ্টি বস্তু খাওয়া, (৫) সদকায়ে ফিৎর আদায় করে যাওয়া আর (৬) ঈদুল আযহার নামাযের পর এসে নিজের কুরবানীর গোশত খাওয়া, (৭) ঈদগাহে ঈদের নামায পড়া, (৮) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া, (৯) এক রাস্তায় যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় প্রত্যাবর্তন করা, (১০) ঈদের নামাযের পূর্বে

বাড়ীতে কিংবা ঈদগাহে নফল নামায না পড়া এবং (১১) ঈদের নামাযের পর ঈদগাহে নফল নামায না পড়া।

প্রশ্ন ঃ ঈদুল ফিৎরের জামাআতে যাবার সময় পথে তাকবীর বলা কেমন ?

উত্তর ঃ ঈদুল ফিৎরে আস্তে আস্তে তাকবীর বলতে বলতে গেলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর ঈদুল আযহায় জোরে জোরে তাকবীর বলতে বলতে যাওয়া মুস্তাহাব।

প্রশ্ন ঃ ঈদের নামায ওয়াজিব না সুন্নত ?

উত্তর ঃ উভয় ঈদের নামাযই ওয়াজিব। আর যাদের উপর জুমুআর নামায ফরয, তাদের উপরই ঈদের নামায ওয়াজিব। জুমুআর যেসব শর্তাদি রয়েছে, ঈদের নামাযের শর্তাদিও তাই। কিন্তু ঈদের নামাযের সময় সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে শেষ হয়ে যায় আর ঈদের নামাযের খুতবা না ফরয, না নামাযের পূর্বে পড়তে হয়; বরং নামাযের পর পড়তে হয় এবং তা সুন্নত।

প্রশ্ন ঃ ঈদের নামায কত রাকআত এবং কি নিয়মে পড়তে হয় ?

উত্তর ঃ উভয় ঈদের নামাযই দু'রাকআত করে। এতদুভয় নামাযের জন্য আযান ও তাকবীর নেই। প্রথমে এভাবে নিয়ত করবে যে, ঈদুল ফিৎর অথবা ঈদুল আযহার ওয়াজিব নামায অতিরিক্ত ছ'তাকবীরের সাথে এ ইমামের পেছনে পড়ছি। তারপর তাকবীরে তাহ্রীমা বলে যথারীতি হাত বেঁধে নেবে এবং সানা পড়বে। তারপর কান পর্যন্ত উভয় হাত তুলতে তুলতে তাকবীর বলে হাত দু'টি ছেড়ে দেবে। পুনরায় দ্বিতীয় বার কান পর্যন্ত হাত তুলে আল্লাহু আকবার বলবে এবং হাত ছেড়ে দেবে। পুনরায় তৃতীয়বার কান পর্যন্ত হাত তুলে তাকবীর বলে হাত বেঁধে নেবে। অতঃপর ইমাম আঊযুবিল্লাহ, বিস্‌মিল্লাহ, সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা পড়ে রুকূ করবেন। দ্বিতীয় রাকআতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ইমাম প্রথমে কেরাআত পড়বেন এবং কেরাআত শেষ করে কান পর্যন্ত হাত তুলে তাকবীর বলবেন এবং হাত ছেড়ে দিবেন। আবার কান পর্যন্ত হাত তুলে দ্বিতীয় তাকবীর বলবেন এবং হাত ছেড়ে দিবেন। অতঃপর আবারও কান পর্যন্ত হাত তুলে তৃতীয় তাকবীর বলবেন এবং হাত ছেড়ে দিবেন। অতঃপর হাত না তুলে চতুর্থ তাকবীর বলে রুকূতে চলে যাবেন এবং যথারীতি নামায পূর্ণ করবেন।

নামায শেষে ইমাম দাঁড়িয়ে খুতবা পড়বেন এবং সাবই নীরবে বসে তা শুনবে। ঈদেও জুমুআর মত দু'টি খুতবা রয়েছে এবং উভয় খুতবার মাঝে বসা সুন্নত।

প্রশ্ন ঃ ঈদুল আযহার বিশেষ আহকাম বা নির্দেশাবলী কি কি ?

উত্তর ঃ পথে জোরে জোরে তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে যাওয়া, নামাযের পূর্বে কোন কিছু না খাওয়া ও তাশরীকের তাকবীরসমূহ ওয়াজিব হওয়া।

প্রশ্ন ঃ তাকবীরাতে তাশরীক অর্থ কি ?

উত্তর ঃ আইয়ামে তাশরীকে ফরয নামাযসমূহের পরে তাকবীর বলা হয়; সে তাকবীরগুলোকেই তাকবীরাতে তাশরীক বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ আইয়ামে তাশরীক কোন্ কোন্ দিন ?

উত্তর ঃ আইয়ামে তাশরীক তিনটি দিনের নাম। যিলহজ্জ চান্দ্র মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে আইয়ামে তাশরীক (বা তাশরীকের দিন) বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ তাকবীরাতে তাশরীক কবে থেকে কবে পর্যন্ত ওয়াজিব ?

উত্তর ঃ আরাফার দিন, কোরবানীর দিন এবং আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন। মোট এ পাঁচ দিন তাকবীর বলা ওয়াজিব।

আরাফার দিন যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখকে এবং কোরবানীর দিন এ মাসের ১০ তারিখকে বলা হয়। ৯ম তারিখের ফজর নামাযের পর থেকে তাকবীর শুরু হয় এবং তারপর থেকে ১৩ই তারিখের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীর বলা ওয়াজিব। ফরযের সালাম ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে তাকবীর বলা কর্তব্য। অবশ্য মহিলারা সশব্দে বলবে না। যদি ইমাম ভুলে যান, তবু মুক্তাদীগণ অবশ্যই বলবে।

প্রশ্ন ঃ তাকবীরে তাশরীক কি এবং কতবার বলা ওয়াজিব ?

উত্তর ঃ তাকবীরে তাশরীক হল–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ–

আর এটি ফরয নামাযের পর একবার বলা ওয়াজিব।

জানাযার নামাযের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ জানাযার নামায ফরয, নাকি ওয়াজিব, না সুন্নত ?

উত্তর ঃ জানাযার নামায ফরযে কেফায়া। যদি দু'একজনেও পড়ে নেয়, তবে সবার উপর থেকে ফরয রহিত হয়ে যাবে। আর কেউই না পড়লে সবাই গোনাহ্গার হবে।

প্রশ্ন ঃ জানাযার নামাযের শর্ত কি কি ?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ, মৃতের মুসলমান হওয়া, দ্বিতীয়তঃ, মৃতের পাক হওয়া, তৃতীয়তঃ, তার কাফন পাক হওয়া, চতুর্থতঃ, সতর আবৃত হওয়া এবং পঞ্চমতঃ, মৃতের লাশ নামাযীদের সামনে বিদ্যমান থাকা।

এ তো ছিল মৃত সংক্রান্ত শর্তাবলীর বর্ণনা। আর নামাযীদের জন্য শুধুমাত্র সময় ছাড়া অন্যান্য ঐ সমস্ত শর্তই রয়েছে যা ইতিমধ্যে নামাযের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ নামাযে জানাযার পুরো নিয়ম কি ?

উত্তর ঃ প্রথমে নামাযের জন্য কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াবে। মানুষ বেশী হলে তিন, পাঁচ কিংবা সাত কাতার করা ভাল। কাতার ঠিক হয়ে গেলে জানাযার নামাযের নিয়ত এভাবে করবে যে, আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে এ জানাযার নামায এ মৃতের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে এ ইমামের পেছনে পড়ছি। তারপর ইমাম জোরে এবং মুক্তাদীগণ আস্তে করে তাকবীর বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত তুলে পরে নাভির নীচে বেঁধে নেবে। অতঃপর ইমাম ও মুক্তাদী সবাই আস্তে আস্তে সানা পড়বে। সানা পড়তে গিয়ে وَتَعَالٰى جَدُّكَ এর পর وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ-ও বললে উত্তম। তারপর ইমাম জোরে এবং মুক্তাদীরা আস্তে হাত না তুলে দ্বিতীয় তাকবীর বলবে এবং নামাযের শেষ বৈঠকে যে দু'টি দুরূদ পড়া হয়, তা ইমাম ও মুক্তাদী সবাই আস্তে আস্তে পড়বে। তারপর দ্বিতীয় তাকবীরের মতই তৃতীয় তাকবীর বলবে এবং যদি জানাযা বালেগ পুরুষ কিংবা মহিলা হয়, তবে ইমাম ও মুক্তাদী সবাই আস্তে আস্তে আরবীতে এ দো'আ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا
وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ
وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ط

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ ও মহিলাদেরকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্য থেকে যাকে তুমি জীবিত রাখ, তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মৃত্যু দান কর, তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর।

জানাযা যদি নাবালেগ বালকের হয়, তবে এ দো'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ط

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এ শিশুকে আমাদের নাজাতের জন্য অগ্রদূত বানিয়ে দাও, এর বিরহের বিপদকে তুমি আমাদের জন্য প্রতিদান ও সঞ্চয় বানিয়ে দাও এবং একে আমাদের শাফা'আতকারী ও শাফা'আত গ্রহণীয় বানিয়ে দাও।

জানাযা যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকার হয়, তার উপরও এ দো'আই পড়বে; কিন্তু তিন জায়গাতে এতটুকু পরিবর্তিত করে নেবে যে, এ তিন জায়গাতে وَاجْعَلْهُ এর স্থলে وَاجْعَلْهَا এবং شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا এর স্থলে شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً পড়বে। এটা শুধু শব্দের তফাত, অর্থ একই।

এরপর ইমাম জোরে এবং মুক্তাদী আস্তে চতুর্থ তাকবীর বলবে। অতঃপর ইমাম জোরে এবং মুক্তাদী আস্তে প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাঁ দিকে সালাম ফেরাবে।

প্রশ্ন ঃ জানাযার নামায শেষ করার পর কি করবে ?

উত্তর ঃ জানাযার নামায শেষ করার সাথে সাথে জানাযাকে তুলে নিয়ে চলবে। চলার সময় কলেমা শরীফ ইত্যাদি পড়তে চাইলে মনে মনে পড়বে; শব্দ করে পড়া মাকরূহ। মৃতের প্রথম মঞ্জিল অর্থাৎ, কবর হিসাব-কিতাব ও দুনিয়ার অবিশ্বস্ততার কথা খেয়াল করবে এবং মনে মনে মৃতের জন্য মাগফেরাত ও আসানীর দো'আ করতে থাকবে। তারপর কবরস্থানে গিয়ে মৃতকে দাফন করবে।

ইসলামী ফরযসমূহের মধ্য থেকে রোযার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ রোযা কাকে বলে ?

উত্তর ঃ সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে খাওয়া দাওয়া তথা পানাহার ও রিপুর কামনা-বাসনা পূরণ করা ছেড়ে দেয়ার নাম রোযা।

রোযাকে সওম ও সিয়াম এবং রোযা খোলাকে ইফতার বলা হয়।

প্রশ্ন : রোযা কত প্রকার ?

উত্তর : রোযা আট প্রকার : (১) নির্ধারিত ফরয রোযা, (২) অনির্ধারিত ফরয রোযা, (৩) নির্ধারিত ওয়াজিব রোযা, (৪) অনির্ধারিত ওয়াজিব রোযা, (৫) সুন্নত রোযা, (৬) নফল রোযা, (৭) মাকরূহ রোযা ও (৮) হারাম রোযা।

প্রশ্ন : নির্ধারিত ফরয রোযা কোন্‌টি ?

উত্তর : সারা বছরে এক মাস অর্থাৎ, রমযান শরীফের রোযাগুলো নির্ধারিত ফরয।

প্রশ্ন : অনির্ধারিত ফরয রোযা কোন্ রোযাগুলো ?

উত্তর : যদি কোন ওযরবশত কিংবা বিনা ওযরে রমযান শরীফের রোযা ছুটে যায়, তবে সেগুলোর কাযা রোযাগুলো অনির্ধারিত ফরয।

প্রশ্ন : নির্ধারিত ওয়াজিব রোযা কোন্‌গুলো ?

উত্তর : নির্ধারিত নযর অর্থাৎ, কোন বিশেষ দিনে কিংবা বিশেষ বিশেষ তারিখের রোযা রাখার মান্নত মানলে সেসব দিন বা তারিখের রোযা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন, কেউ মান্নত মানল যে, যদি আমি পরীক্ষায় পাশ করি, তবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে রজবের পহেলা তারিখের রোযা রাখব।

প্রশ্ন : অনির্ধারিত ওয়াজিব রোযা কোন্‌গুলো ?

উত্তর : কাফ্‌ফারার রোযা এবং অনির্দিষ্ট মান্নতের রোযা অনির্ধারিত ওয়াজিব। যেমন, কেউ মান্নত মানল যে, যদি আমি প্রথম হয়ে পাশ করি, তবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তিনটি রোযা রাখব।

প্রশ্ন : কোন্ রোযা সুন্নত ?

উত্তর : রোযার মধ্যে কোন রোযাই সুন্নতে মুআক্কাদা নেই। তবে যেসব দিনের রোযা মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিজে রাখার কিংবা রাখার জন্য উৎসাহিত করার কথা প্রমাণিত আছে, সেগুলোকে সুন্নত বলে। যেমন, আশুরার দু'টি রোযা। অর্থাৎ, মুহাররমের নয় ও দশ তারিখের রোযা। (আশুরা মুহাররমের দশম তারিখের নাম) আরাফা অর্থাৎ, যিলহজ্জের নয় তারিখের রোযা এবং আইয়ামে বীযের রোযা অর্থাৎ, প্রত্যেক মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রোযা।

প্রশ্ন ঃ মুস্তাহাব রোযা কোন্‌গুলো ?

উত্তর ঃ ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত রোযার পর সমস্ত রোযাই মুস্তাহাব। তবে কোন কোন রোযা এমন রয়েছে যেগুলোর সওয়াব বেশী। যেমন, শাওয়ালের ছ'টি রোযা, শা'বান মাসের পনের তারিখের রোযা, জুমুআর দিনের রোযা, সোমবারের রোযা, বৃহস্পতিবারের রোযা।

প্রশ্ন ঃ কোন্ রোযা মাকরূহ ?

উত্তর ঃ শুধু শনিবার দিনের রোযা, শুধু আশুরা তথা দশম তারিখের রোযা, নববর্ষের প্রথম তারিখের রোযা এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন মহিলার নফল রোযা রাখা।

প্রশ্ন ঃ হারাম রোযা কোন্‌গুলো ?

উত্তর ঃ বছরের পাঁচটি রোযা হারাম। ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার দু'টি রোযা ও আইয়ামে তাশরীকের তিনটি রোযা। আইয়ামে তাশরীক বলা হয়, যিলহজ্জ মাসের এগার, বার ও তের তারিখকে।

রমযান শরীফের রোযার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ রমযান শরীফের রোযার ফযীলত কি ?

উত্তর ঃ রমযান শরীফের রোযার সওয়াব বিরাট এবং হাদীস শরীফে বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি খাসভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য রমযান শরীফের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। আরেক হাদীসে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মেশকের সুগন্ধী অপেক্ষা উত্তম। তৃতীয় আরেক হাদীসে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, রোযা হল খাস করে আমার জন্য আর আমি নিজে এর প্রতিদান দেব। এমনিভাবে আরো বহু ফযীলত হাদীসে এসেছে।

প্রশ্ন ঃ রমযান শরীফের রোযা কাদের উপর ফরয ?

উত্তর ঃ প্রত্যেক মুসলমান বুদ্ধিমান, বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক,) পুরুষ ও মহিলার উপরই ফরয। এর ফরযিয়ত (ফরয হওয়া)-এর অস্বীকারকারী কাফের। আর বিনা ওযরে বর্জনকারী কঠিন গোনাহ্‌গার ও ফাসেক।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক নাবালেগের উপর যদিও নামায রোযা ফরয নয়, কিন্তু অভ্যস্ত করে তোলার জন্য সাবালকত্বের পূর্বেই রোযা রাখানো ও নামায পড়ানোর

নির্দেশ রয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন শিশু সাত বছরের হয়ে যাবে, তখন তাকে নামাযের নির্দেশ দাও আর যখন দশ বছরের হয়ে যায়, তখন (প্রয়োজন বোধে) নামাযের জন্য মার-ধরও করা উচিত। এমনিভাবে যখন শিশুদের মধ্যে রোযা রাখার মত সামর্থ্য হয়ে যায়, তখন যতটা রোযাই সে রাখতে পারুক, ততটাই তাকে রাখানো উচিত।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ ওযরের কারণে রোযা না রাখা জায়েয ?

উত্তর ঃ (১) সফর, অর্থাৎ, মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রোযা না রাখা জায়েয; কিন্তু সফরে কষ্ট না হলে রোযা রাখাটাই উত্তম, (২) রোগ, অর্থাৎ, এমন রোগ-ব্যাধি যার কারণে রোযা রাখার শক্তিই নেই কিংবা রোগ বেড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে, (৩) বেশী বার্ধক্য, (৪) গর্ভবতী হওয়া। যখন রোযার দরুন মহিলার কিংবা গর্ভস্থ্ সন্তানের ক্ষতির প্রবল সম্ভাবনা থাকে; (৫) দুধ খাওয়ানো। যখন রোযার দরুন দুগ্ধধাত্রী কিংবা শিশুর ক্ষতি হয়, (৬) রোযার দরুন এত অধিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার সম্মুখীন হওয়া, যাতে প্রাণ বায়ু বের হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং (৭) হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয নয়।

চাঁদ দেখা ও তার সাক্ষ্যের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ রমযান শরীফের চাঁদ দেখার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ শা'বানের উনত্রিশ তারিখে রমযানের চাঁদ দেখা অর্থাৎ, দেখার জন্য চেষ্টা করা এবং উদয়স্থলে তালাশ করা ওয়াজিব। আর রজবের উনত্রিশ তারিখে শা'বানের চাঁদ দেখা মুস্তাহাব, যাতে শা'বানের উনত্রিশ তারিখের হিসাব সঠিক জানা থাকে। যদি শা'বানের উনত্রিশ তারিখে রমযান শরীফের চাঁদ দেখা যায়, তবে ভোরে রোযা রাখবে। আর উদয়স্থান পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা না গেলে রোযা রাখবে না। আর যদি উদয়স্থলে মেঘমালা অথবা গোধূলী থেকে থাকে, তবে ভোরে দশ-এগারটা বাজা পর্যন্ত কোন কিছু পানাহার করবে না। তখন পর্যন্ত যদি কোথাও থেকে চাঁদ দেখার গ্রহণযোগ্য পন্থায় খবর এসে যায়, তাহলে রোযার নিয়ত করে নেবে। আর না এলে পানাহার করবে। কিন্তু শা'বানের উনত্রিশ তারিখে চাঁদ না দেখার অবস্থায় ভোরে এভাবে নিয়ত করা মাকরূহ যে, চাঁদ হয়ে গেলে রমযানের রোযা আর না হলে নফল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ রমযান শরীফের চাঁদের জন্য গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য কি ?

উত্তর ঃ যদি মাতলা তথা উদয়স্থল পরিষ্কার না হয়, অর্থাৎ, তাতে মেঘ বা গোধূলী প্রভৃতি থাকে, তবে রমযান শরীফের চাঁদের জন্য একজন দ্বীনদার (ধর্মপরায়ণ) পরহেযগার (নিষ্ঠাবান) সত্যবাদী লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, সে পুরুষ হোক বা মহিলা, আযাদ হোক বা গোলাম। তেমনিভাবে যার ফাসেক হওয়ার ব্যাপার প্রকাশ্য নয় এবং বাহ্যতঃ দ্বীনদার-পরহেযগার বলে মনে হয়, তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ঃ ঈদের চাঁদের জন্য গ্রহণীয় সাক্ষ্য কি ?

উত্তর ঃ মাতলা পরিষ্কার না হলে ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার জন্য দু'জন পরহেযগার সত্যবাদী পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য শর্ত।

প্রশ্ন ঃ মাতলা পরিষ্কার হলে কতজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ?

উত্তর ঃ মাতলা যদি পরিষ্কার হয়, তবে রমযান ও উভয় ঈদের চাঁদের জন্য অন্ততঃ এত মানুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন যে, তাদের এক সঙ্গে মিথ্যা বলা ও মনগড়া কথা বলার ব্যাপারে মনের বিশ্বাস হতে পারে না; বরং তাদের সাক্ষ্যে মনে চাঁদ দেখা যাওয়ার ধারণা প্রবল হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ কোন দূরবর্তী শহর থেকে চাঁদ দেখার খবর এলে, তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা ?

উত্তর ঃ যতদূর থেকেই খবর আসুক, গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন, বর্মার লোকেরা চাঁদ দেখল না, অথচ বোম্বাইর কোন লোক তাদের সামনে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। এমতাবস্থায় তাদের উপর একটি রোযার কাযা করা অপরিহার্য হবে। তবে শর্ত হল এই যে, এমন পন্থায় খবর আসতে হবে, যা শরীঅতে গ্রহণীয়।

প্রশ্ন ঃ কোন লোক যদি রমযানের চাঁদ দেখে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা না হয়, অথচ তাকে ছাড়া অন্য কেউ চাঁদ না দেখে কিংবা রোযা না রাখে, তবে সে লোকটির উপর রোযা ফরয কিনা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তার উপর রোযা রাখা ফরয। আর তার হিসেবে যদি (মাস শেষে) ত্রিশ রোযা পূর্ণ হয়ে যায়, অথচ চাঁদ দেখা না যায়, তবে সে অন্যান্য লোকদের সাথে একত্রিশতম রোযাও রাখবে।

নিয়তের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ রোযার জন্য কি নিয়ত করা জরুরী ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, রোযার জন্য নিয়ত করা শর্ত। ঘটনাক্রমে যদি সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু রোযার নিয়ত না করে থাকে, তবে রোযা হবে না।

প্রশ্ন ঃ নিয়ত কখন করা জরুরী ?

উত্তর ঃ রমযান শরীফ, নির্ধারিত মান্নত, সুন্নত ও নফল রোযার নিয়ত রাত থেকে করবে বা ভোরে অর্ধ দিনের আগে পর্যন্ত জায়েয। দিন বলতে শরীঅত নির্ধারিত দিন বুঝায় যা সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের নাম। যেমন, চারটার সময় সুবহে সাদেক হলে এবং ছ'টার সময় সূর্যাস্ত হলে শরয়ী দিন হল চৌদ্দ ঘন্টার। আর অর্ধ দিন হল সকাল এগারটায়। এমতাবস্থায় এগারটার আগে আগে নিয়ত করে নেয়া জরুরী।

আর রমযানের কাযা ও কাফ্ফারা এবং অনির্ধারিত মান্নতের রোযার নিয়ত সুবহে সাদেকের পূর্বে করে নেয়া জরুরী।

প্রশ্ন ঃ নিয়ত কিভাবে করা উচিত ?

উত্তর ঃ রমযান শরীফ, নির্ধারিত মান্নত, সুন্নত ও নফল রোযার নিয়তে ইচ্ছা করলে বিশেষ করে সেসব রোযার ইচ্ছা করবে কিংবা শুধু এমন ইচ্ছা করে নেবে যে, আমি রোযা রাখছি অথবা নফল রোযার নিয়ত করবে। মোটকথা, রমযান শরীফে রমযানের রোযা, নির্ধারিত মান্নতের দিনে মান্নতের রোযা এবং অন্যান্য দিনে সুন্নত কিংবা নফল রোযা হয়ে যাবে। আর অনির্ধারিত মান্নত, কাফ্ফারা ও রমযানের কাযার নিয়তে বিশেষভাবে সেসব রোযারই নিয়ত করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ মুখে নিয়ত করা জরুরী কিনা ?

উত্তর ঃ নিয়ত বলা হয় ইচ্ছা ও সংকল্পকে। কাজেই মনে মনে ইচ্ছা করে নেয়াই যথেষ্ট। মুখে বললে ভাল। না বললেও কোন ক্ষতি নেই।

রোযার মুস্তাহাব বিষয়সমূহের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ রোযার মুস্তাহাব কি কি ?

উত্তর ঃ (১) সেহরী খাওয়া, (২) রাত থেকে নিয়ত করা, (৩) শেষ সময়ে সেহরী খাওয়া এ শর্তে যে, সুবহে সাদেকের পূর্বে অবশ্যই শেষ করবে,

(৪) সূর্যাস্তের ব্যাপারে সন্দেহ না থাকলে তাড়াতাড়ি ইফতার করা, (৫) গীবত, মিথ্যা, গালি-গালাজ প্রভৃতি মন্দ বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, (৬) খোরমা কিংবা খেজুর দ্বারা এবং এ সব না থাকলে পানি দ্বারা ইফতার করা।

প্রশ্ন ঃ সেহরী কাকে বলে এবং এর সময় কখন ?

উত্তর ঃ শেষ রাতে সুবহে সাদেকের পূর্বে কোন কিছু পানাহারকে সেহরী বলে। রাতের শেষ ভাগে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত এর সময়। সেহরী খাওয়া সুন্নত এবং এর সওয়াব বিপুল। ক্ষুধা না থাকলে অন্ততঃ দু'এক লুকমা হলেও খাওয়া উচিত।

রোযার মাকরূহসমূহের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ রোযার মধ্যে কি কি বিষয় মাকরূহ ?

উত্তর ঃ (১) গোন্দ (এক প্রকার আঠা) চাবানো কিংবা অন্য কোন জিনিস মুখে দিয়ে রাখা, (২) কোন জিনিস চাখা। অবশ্য কোন মহিলার স্বামী বদমেযাজ হলে তার পক্ষে তরকারির লবণ জিহ্বার আগা দিয়ে চেখে নেয়া জায়েয, (৩) এস্তেঞ্জা করার সময় পা অতিরিক্ত ছড়িয়ে বসা এবং কুল্লি বা নাকে পানি দেয়ার সময় বাড়াবাড়ি করা, (৪) মুখে অনেক পরিমাণ থুথু জমিয়ে গিলে ফেলা, (৫) গীবত করা, মিথ্যা বলা, গালি-গালাজ করা, (৬) অস্থিরতা ও ভীতি প্রকাশ করা, (৭) গোসলের প্রয়োজন হয়ে গেলে গোসল করাকে ইচ্ছাকৃতভাবে সুবহে সাদেকের পর পর্যন্ত বিলম্বিত করা এবং (৮) কয়লা চিবিয়ে কিংবা মাজন দিয়ে দাঁত মাজা।

প্রশ্ন ঃ কোন্ বিষয়গুলোতে রোযা মাকরূহ হয় না ?

উত্তর ঃ (১) সুর্মা লাগানো, (২) শরীরে কিংবা মাথায় তেল দেয়া, (৩) ঠাণ্ডার জন্য গোসল করা, (৪) তাজা জড় বা ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা, (৫) সুগন্ধী লাগানো বা ঘ্রাণ লওয়া, (৬) ভুলবশত কোন কিছু খেয়ে ফেলা, (৭) আপনা থেকে অনিচ্ছাকৃত বমি হয়ে যাওয়া, (৮) নিজের থুথু গিলে ফেলা, (৯) অনিচ্ছাকৃতভাবে মাছি-মশা কিংবা ধুয়া গলায় ঢুকে পড়া প্রভৃতি কারণে রোযা ভাঙ্গেও না, মাকরূহও হয় না।

রোযা ভাঙ্গার কারণসমূহ

প্রশ্ন ঃ রোযার মুফসেদাত বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ মুফসেদাত সেসব বিষয়কে বলা হয়, যার দরুন রোযা ভেঙ্গে যায়। মুফসেদাত দু'রকম। এক– যার দরুন শুধু কাযা ওয়াজিব হয়, আর দ্বিতীয়টি হল, যার দরুন কাযা ও কাফ্ফারা দু'টোই ওয়াজিব হয়।

প্রশ্ন ঃ যে সব মুফসেদাতে শুধু কাযা ওয়াজিব হয় সেগুলো কি কি ?

উত্তর ঃ (১) কেউ রোযাদারের মুখে জবরদস্তি করে কোন কিছু ঢুকিয়ে দিল এবং তা গলার ভেতরে চলে গেল, (২) রোযার কথা মনে ছিল অথচ কুল্লি করার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে গলার ভেতরে পানি ঢুকে গেল, (৩) বমি এলো এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তা গলার ভেতরে ফিরিয়ে নিল, (৪) ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করে ফেলল, (৫) কঙ্কর, পাথরখণ্ড, কোন বীচি, মাটি, কিংবা কাগজের টুকরা ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলল, (৬) দাঁতে লেগে থাকা বস্তু জিহ্বার দ্বারা বের করে মুখের বাইরে বের করে আনার পর গিলে ফেলল, তখন সেটি একটি বুটের (চানা) সমান বা তার চেয়ে কম হলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে, (৭) কানের ভেতরে তেল দেয়া, (৮) নস্যি নেয়া, (৯) দাঁত থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত থুথুর উপর প্রবল হলে তা গিলে ফেলা, (১০) ভুলবশত কোন কিছু খেয়ে ফেলার পর রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে ফেলল, (১১) সুবহে সাদেক হয়নি ভেবে সেহরী খাবার পর জানতে পারল যে, সুবহে সাদেক হয়ে গিয়েছিল, (১২) রমযান শরীফের রোযা ছাড়া অন্যান্য দিনের কোন রোযা ইচ্ছাকৃত ভেঙ্গে ফেলল, (১৩) মেঘ বা কুয়াশার দরুন সূর্য অস্ত চলে গেছে মনে করে ইফতার করে ফেলার পর জানতে পারল যে, তখনো দিন বাকী ছিল– এ সব অবস্থায় শুধু সে দিনের রোযার কাযা করতে হবে, যাতে এ সব বিষয়ের মধ্যে কোনটি ঘটে থাকবে।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ অবস্থায় কাযা ও কাফ্ফারা দু'টোই ওয়াজিব হয় ?

উত্তর ঃ রমযান শরীফের রোযা রাখার পর (১) এমন কোন বস্তু যা খাদ্য কিংবা ঔষধ কিংবা পুলক সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় ইচ্ছাকৃতভাবে খাওয়া বা পান করা, (২) ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করা, (৩) সিঙ্গা কিংবা সুর্মা লাগানোর পর রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে স্বেচ্ছায় পানাহার করে ফেললে কাযা ও কাফ্ফারা দু'টিই ওয়াজিব হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ রমযানের মাসে যদি কারো রোযা ভেঙ্গে যায়, তাহলে তার পক্ষে পানাহার করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ না; বরং তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার প্রভৃতি থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। এমনিভাবে যদি কোন মুসাফির দিনের বেলায় নিজের বাড়িতে চলে আসে কিংবা নাবালেগ ছেলে বালেগ হয়ে যায় অথবা নেফাস ও ঋতুবতী মহিলা পাক হয়ে যায় কিংবা পাগল যদি সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে তাদের জন্যও বাকী দিনটিতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযাদারদের মত থাকা ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ রমযান শরীফ ছাড়া অন্য কোন রোযা ভাংলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় কিনা?

উত্তর ঃ কাফ্ফারা শুধু রমযান মাসের ফরয রোযা ভাংলেই ওয়াজিব হয়। রমযান শরীফের রোযা ছাড়া অন্য কোন রোযা ভাংলে তা রমযানের কাযা রোযা হলেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না।

রোযার কাযার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ রোযার কাযা ওয়াজিব (ফরয) হওয়ার কি কি কারণ হতে পারে ?

উত্তর ঃ (১) বিনা ওযরে ফরয কিংবা নির্ধারিত ওয়াজিব রোযা না রাখলে, (২) কোন ওযরবশত কিছু রোযা বাদ পড়ে গেলে এবং (৩) রোযা রেখে কোন কারণে ভেঙ্গে ফেললে বা ভেঙ্গে গেলে সেসব রোযার কাযা করা ফরয।

প্রশ্ন ঃ কাযা রোযা কখন রাখা উচিত ?

উত্তর ঃ যখনই সময় হয়, তখন যত শীঘ্র রাখা যায় রেখে ফেলা উত্তম। বিনা কারণে দেরী করা খারাপ।

প্রশ্ন ঃ কাযা রোযা লাগাতার রাখা জরুরী কিনা?

উত্তর ঃ লাগাতারও রাখা যায়, মাঝে ফাঁক দিয়েও রাখা যায়।

প্রশ্ন ঃ পূর্ববর্তী রমযানের রোযার কাযা থাকতেই যদি আরেক রমযান এসে যায়, তবে কি করতে হবে ?

উত্তর ঃ এখন চলতি রমযানের রোযা রাখবে এবং রমযানের পর পূর্ববর্তী রোযাসমূহের কাযা রাখবে।

প্রশ্ন ঃ নফল রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেললে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ তার কাযা করা ওয়াজিব। কারণ, নফল নামায এবং নফল রোযা শুরু করার পর ওয়াজিব হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ কাযা রোযা রাখার ক্ষমতা না থাকলে কি করবে ?

উত্তর ঃ যদি এমন বুড়ো হয়ে গিয়ে থাকে যে, রোযা রাখতে পারছে না এবং ভবিষ্যতে ক্ষমতা ফিরে পাবারও আশা না থাকে কিংবা এমন অসুস্থ পড়ে যে, সুস্থতার কোন আশা না থাকে, তবে এসব অবস্থায় রোযাসমূহের 'ফিদ্ইয়া' দিয়ে দেয়া জায়েয।

প্রশ্ন ঃ রোযার ফিদ্ইয়া কি ?

উত্তর ঃ প্রতিটি রোযার বদলায় পৌনে দু'সের গম অথবা সাড়ে তিন সের জব কিংবা এর যে কোন একটির মূল্য কিংবা তার সমমূল্যের অন্য কোন খাদ্যশস্য। যেমন, চাল, বাজরা, জোয়ার প্রভৃতি।

তাছাড়া প্রত্যেক ফরয ও ওয়াজিব নামাযের ফিদ্ইয়ার পরিমাণও তাই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত নামায মাথার ইশারায়ও আদায় করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ইশারার দ্বারাই আদায় করা ফরয। যখন ইশারাও করতে না পারবে এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে কিংবা ছয়টি নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন এ অবস্থায় নামায ফরয নয়। সুতরাং নামাযের ফিদ্ইয়া তখনই দিতে হবে, যখন নামায পড়ার সামর্থ্য থাকা অবস্থায় নামায কাযা হবে এবং আদায় না করে মৃত্যুবরণ করবে।

প্রশ্ন ঃ একজনের উপর কিছু রোযা কাযা ছিল। তার মৃত্যু হয়ে গেলে তার পক্ষ থেকে কেউ রোযা রেখে নিলে তা জায়েয হবে কিনা ?

উত্তর ঃ না। অর্থাৎ, সে মৃতব্যক্তির উপর থেকে রোযা রহিত হবে না। তবে ওয়ারিসরা ফিদ্ইয়া দিয়ে দিলে তা জায়েয হবে।

কাফ্ফারার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ রোযা ভাঙ্গার কাফ্ফারা কি ?

উত্তর ঃ কাফ্ফারা হল একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। কিন্তু এসব দেশে (অথবা এ যুগে) ক্রীতদাস (প্রথা) নেই। কাজেই এখানে শুধু দু'টি উপায়ে কাফ্ফারা দেয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ, দু'মাস লাগাতার রোযা রাখবে এবং দ্বিতীয়তঃ, যদি দু'মাস লাগাতার রোযা রাখার ক্ষমতা না থাকে, তবে ষাটজন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে খানা খাওয়াবে কিংবা

ষাটজন মিসকীনকে মাথাপিছু পৌনে দু'সের গম অথবা তার মূল্য অথবা সমমূল্যের চাল, বাজরা বা জোয়ার দিয়ে দেবে। (সের হল ৮০ তোলা পরিমাণ।)

প্রশ্ন ঃ ষাটজন মিসকীনের খাদ্যশস্য যেমন, দু'মন পঁচিশ সের গম একজন মিসকীনকে দেয়া জায়েয কিনা ?

উত্তর ঃ একজন মিসকীনকে যদি প্রতিদিন এক দিনের শস্য (পৌনে দু'সের গম) দেয়া হয় কিংবা তাকে ষাট দিন পর্যন্ত দু'বেলা পেট ভরে খানা খাওয়ানো হয়, তাহলে জায়েয। কিন্তু এক দিনে যদি এক দিনের (জন্য নির্ধারিত পরিমাণের) বেশী শস্য কিংবা তার মূল্য দিয়ে দেয়া হয়, তবে এক দিনের কাফ্‌ফারা শুদ্ধ হবে এবং এক দিন থেকে যে পরিমাণ বেশী দেয়া হয়েছে, তা কাফ্‌ফারায় গণ্য হবে না।

প্রশ্ন ঃ যদি একজন মিসকীনকে পৌনে দু'সেরের কম দেয়া হয়, তবে জায়েয কিনা ?

উত্তর ঃ না, জায়েয নয়; বরং কাফ্‌ফারায় একজন মিসকীনকে পৌনে দু'সের গম অর্থাৎ, এক দিনের শস্যের পরিমাণ থেকে কম দেয়া কিংবা এক দিনে এক দিনের পরিমাণের চেয়ে বেশী দেয়া জায়েয নয়।

প্রশ্ন ঃ যদি এক রমযানের কয়েকটি রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তবে কি হুকুম ?

উত্তর ঃ একটি কাফ্‌ফারাই ওয়াজিব হবে।

এ'তেকাফের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ এ'তেকাফ কাকে বলে ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্‌র ঘরে (অর্থাৎ, মসজিদে) অবস্থান করাকে এবাদত মনে করে এর নিয়তে যে মসজিদে জামাআত হয়, এমন মসজিদে অবস্থান করাকে এ'তেকাফ বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ শুধু মসজিদে অবস্থান করা এবাদত কেন ?

উত্তর ঃ যখন মানুষ তার হাসি-আনন্দ, চলাফেরা ও কাজকর্ম ছেড়ে মসজিদে অবস্থান করবে এবং এ অবস্থানে যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হবে, তখন এর এবাদত হওয়াই তো স্বাভাবিক।

প্রশ্ন ঃ মহিলা কোথায় এ'তেকাফ করবে ?

উত্তর ঃ নিজের ঘরে যে জায়গায় সে নামায পড়ে, এ'তেকাফের নিয়ত করে সেখানেই সর্বক্ষণ অবস্থান করবে। প্রস্রাব-পায়খানা ছাড়া অন্য কোন

কাজের জন্য সেখান থেকে উঠে বাড়ির চত্বর কিংবা অন্য কোন অংশে যাবে না। আর ঘরে যদি নামাযের কোন নির্ধারিত জায়গা না থাকে, তবে এ'তেকাফ শুরু করার পূর্বে এমন জায়গা তৈরি করে নেবে এবং তারপর সেখানে এ'তেকাফ করবে।

প্রশ্ন ঃ এ'তেকাফের উপকারিতা কি কি ?

উত্তর ঃ এ'তেকাফের উপকারিতা হল ঃ (১) এ'তেকাফকারী যেন নিজের সমস্ত দেহ-মন ও সময়কে আল্লাহ্ তা'আলার এবাদতের জন্য ওয়াকফ্ করে দেয়, (২) পার্থিব ঝগড়া-বিবাদ এবং অন্যান্য বহু গোনাহ্ থেকে নিরাপদ থাকে, (৩) এ'তেকাফের অবস্থায় সর্বক্ষণ সে নামাযের সওয়াব পেতে থাকে। কারণ, এ'তেকাফের আসল উদ্দেশ্য এটাই যে, এ'তেকাফকারী যেন সর্বক্ষণ সাগ্রহে নামায ও জামাআতের অপেক্ষায় বসে থাকে, (৪) এ'তেকাফের অবস্থায় এ'তেকাফকারী ফেরেশতাদের তুলনা সৃষ্টি করে। তাঁদেরই মত সর্বক্ষণ এবাদত-বন্দেগী ও তসবীহ্-তাকদীসে নিরত থাকে এবং (৫) মসজিদ যেহেতু আল্লাহ্র ঘর, তাই এ'তেকাফে এ'তেকাফকারী আল্লাহ্র পড়শী, বরং আল্লাহ্র ঘরের মেহমান হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ঃ এ'তেকাফ কত প্রকার ?

উত্তর ঃ তিন প্রকার ঃ (১) ওয়াজিব, (২) সুন্নতে মুআক্কাদা ও (৩) মুস্তাহাব।

প্রশ্ন ঃ ওয়াজিব এ'তেকাফ কোন্‌টি ?

উত্তর ঃ মান্নতের এ'তেকাফ ওয়াজিব। যেমন, কেউ মান্নত মানল যে, আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে তিন দিনের এ'তেকাফ করব কিংবা এভাবে বলল যে, যদি আমার অমুক কাজটি হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে দু'দিনের এ'তেকাফ করব।

প্রশ্ন ঃ কোন্ এ'তেকাফ সুন্নতে মুআক্কাদা ?

উত্তর ঃ রমযান মাসের শেষ দশ দিনের এ'তেকাফ সুন্নতে মুআক্কাদা। এটি কুড়ি তারিখের সন্ধ্যা অর্থাৎ, সূর্যাস্তের সময় থেকে শুরু হয় এবং ঈদের চাঁদ দেখার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। চাঁদ ঊনত্রিশেরই হোক কিংবা ত্রিশের উভয় অবস্থাতেই সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। এ এ'তেকাফ সুন্নতে মুআক্কাদা আলাল কেফায়া। অর্থাৎ, কিছু লোক করলেই সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ মুস্তাহাব এ'তেকাফ কোন্‌টি ?

উত্তর ঃ ওয়াজিব ও সুন্নত এ'তেকাফ ছাড়া সব এ'তেকাফই মুস্তাহাব। বছরের সব দিনেই এ'তেকাফ জায়েয।

প্রশ্ন ঃ এ'তেকাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কি কি শর্ত রয়েছে ?

উত্তর ঃ (১) মুসলমান হওয়া, (২) হদসে আকবর ও (৩) হায়েয নেফাস থেকে পাক হওয়া, (৪) বুদ্ধিমান হওয়া, (৫) নিয়ত করা এবং (৬) যে মসজিদে জামাআত হয়, তাতে এ'তেকাফ করা। এ সব বিষয় তো সব এ'তেকাফের জন্যই শর্ত। তদুপরি ওয়াজিব এ'তেকাফের জন্য রোযাও শর্ত।

এ'তেকাফের মুস্তাহাব বিষয়সমূহ

প্রশ্ন ঃ এ'তেকাফে কি কি বিষয় মুস্তাহাব ?

উত্তর ঃ (১) সৎ ও ভাল কথা বলা, (২) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, (৩) দুরূদ শরীফ পাঠ করা, (৪) দ্বীনী জ্ঞান চর্চা করা, (৫) ওয়ায-নসীহত করা এবং (৬) জামে মসজিদে এ'তেকাফ করা।

এ'তেকাফের সময়

প্রশ্ন ঃ এ'তেকাফের সর্বনিম্ন সময় কত ?

উত্তর ঃ ওয়াজিব এ'তেকাফের জন্য যেহেতু রোযা শর্ত, সেজন্য তার সময় এক দিন। সুতরাং এক দিনের কম, যেমন দু'চার ঘন্টা কিংবা রাতের এ'তেকাফের মান্নত মানা শুদ্ধ নয়।

আর যে এ'তেকাফ সুন্নতে মুআক্কাদা, তার সময় হল রমযান শরীফের শেষ দশ দিন। আর নফল এ'তেকাফের জন্য সময়ের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। অর্থাৎ, নফল এ'তেকাফ পাঁচ-দশ মিনিটেরও হতে পারে। মসজিদে ঢোকার সময় এ'তেকাফের নিয়ত করে নিলে প্রতিদিন বহু এ'তেকাফের সওয়াব পাওয়া যেতে পারে।

এ'তেকাফে জায়েয বিষয়সমূহের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ এ'তেকাফকারীর জন্য কোন্‌ কোন্‌ ওযরের দরুন মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয ?

উত্তর ঃ (১) পেশাব-পায়খানার জন্য বের হওয়া, (২) ফরয গোসলের জন্য বের হওয়া, (৩) জুমুআর নামাযের জন্য দুপুর বেলায় কিংবা এতটা সময় পূর্বে বের হওয়া, যাতে জামে মসজিদে পৌঁছে খুতবার পূর্ববর্তী চার রাকআত সুন্নত পড়তে পারে, (৪) আযান দেয়ার জন্য মসজিদের বাইরে আযানের জায়গা পর্যন্ত যাওয়া।

প্রশ্ন ঃ পেশাব-পায়খানার জন্য কতদূর যাওয়া জায়েয ?

উত্তর ঃ নিজের বাড়ী যত দূরেই হোক সেখান পর্যন্ত যাওয়া জায়েয। তবে তার যদি দু'টি বাড়ী থাকে, একটি এ'তেকাফ স্থলের কাছে এবং অন্যটি দূরে থাকে, তবে যেটি কাছে, তাতেই প্রয়োজন সারা জরুরী।

প্রশ্ন ঃ জানাযা নামাযের জন্য এ'তেকাফকারীর মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয কিনা ?

উত্তর ঃ এ'তেকাফ করার সময় সে যদি নিয়ত করে থাকে যে, জানাযার নামাযের জন্য যাবে, তবে জায়েয। আর নিয়ত না করে থাকলে জায়েয নয়।

প্রশ্ন ঃ এ'তেকাফে আর কি কি বিষয় জায়েয ?

উত্তর ঃ মসজিদে পানাহার, ঘুমানো, কোন প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করা, তবে শর্ত হল, সে জিনিসটি যেন মসজিদে না হয় এবং বিয়ে করা জায়েয।

এ'তেকাফের মাকরূহ ও ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ এ'তেকাফে কি কি বিষয় মাকরূহ ?

উত্তর ঃ (১) সম্পূর্ণভাবে নীরবতা অবলম্বন করা এবং একে এবাদত মনে করা এবং (২) কোন সামগ্রী মসজিদে এনে বেচা-কেনা করা। (৩) ঝগড়া-বিবাদ কিংবা অহেতুক কথাবার্তা বলা।

প্রশ্ন ঃ কি কি করণে এ'তেকাফ ভেঙ্গে যায় ?

উত্তর ঃ (১) বিনা ওযরে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মসজিদ থেকে বাইরে বের হওয়া, (২) এ'তেকাফের অবস্থায় সহবাস করা, (৩) কোন ওযরের কারণে বাইরে বেরিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাইরে থাকা। যেমন, পায়খানার জন্য বাড়ী গেল এবং পেশাব-পায়খানা সেরেও বাড়ীতে কিছু সময় অবস্থান করল এবং (৪) অসুস্থতা কিংবা ভয়ের কারণে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া। এ সব অবস্থায়ই এ'তেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ এ'তেকাফ ফাসেদ তথা নষ্ট হয়ে গেলে তার কাযা ওয়াজিব কিনা ?

উত্তর ঃ ওয়াজিব এ'তেকাফের কাযা ওয়াজিব; সুন্নত ও নফলের কাযা ওয়াজিব নয়।

নযর বা মান্নতের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ মান্নত মানা কি ?

উত্তর ঃ জায়েয। আর মান্নত মেনে তা পূরণ করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ সব মান্নতই কি পূরণ করা ওয়াজিব ?

উত্তর ঃ যে মান্নত শরীঅতবিরোধী কাজের জন্য মানা না হয় এবং তার শর্ত-শরায়েতও পাওয়া যায়, তা পূরণ করা ওয়াজিব। আর যে মান্নত শরীঅতবিরোধী কাজের জন্য করা হয়, তা পূরণ করা নাজায়েয।

প্রশ্ন ঃ মান্নত শুদ্ধ হওয়ার শর্ত কি কি ?

উত্তর ঃ (১) মান্নত কোন এবাদতের হতে হবে। যেমন, আমার অমুক কাজটি হয়ে গেলে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দু'রাকআত নামায পড়ব অথবা রোযা রাখব কিংবা এতজন মিসকীনকে খানা খাওয়াব কিংবা হাজার টাকা সদকা করব। (২) আর যে বিষয়ের মান্নত মানবে, তা যেন তার ক্ষমতার বাইরে না হয়। অন্যথায় মান্নত শুদ্ধ হবে না। যেমন, কেউ বলল, আমার অমুক কাজটি হয়ে গেলে আমি অমুক ব্যক্তির দোকানের মালামাল খয়রাত করে দেব। এ মান্নত শুদ্ধ নয়। কারণ, অন্য কারো দোকানের মালামালে তার মালিকানা নেই এবং তা তার ক্ষমতা বহির্ভূত। এছাড়া আরোও কিছু শর্ত রয়েছে যা বড় বড় কিতাবে পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন ঃ কোন ওলী কিংবা পীরের নামে মান্নত মানা কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কারো নামে মান্নত মানা হারাম। কারণ, মান্নতও এক রকম এবাদত, আর আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউ এবাদতের হকদার নেই।

যাকাতের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ যাকাত কাকে বলে ?

উত্তর ঃ সম্পদের সেই বিশেষ অংশকে যাকাত বলা হয়, যা আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক ফকীর, মিসকীন ও অভাবী লোকদেরকে দিয়ে তাদেরকে

তার মালিক বা অধিকারী বানিয়ে দেয়া হয়। এভাবে বলা যেতে পারে যে, নামায-রোযা হল দৈহিক এবাদত আর যাকাত আর্থিক এবাদত।

প্রশ্ন ঃ যাকাত ফরয নাকি ওয়াজিব ?

উত্তর ঃ যাকাত দেয়া ফরয। কোরআন মজীদের আয়াত এবং রাসূলে করীম (দঃ)-এর হাদীসের দ্বারা এর ফরয হওয়া প্রমাণিত রয়েছে। যে লোক যাকাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফের।

প্রশ্ন ঃ যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত কয়টি ?

উত্তর ঃ (১) মুসলমান হওয়া, (২) স্বাধীন হওয়া, (৩) বুদ্ধিমান হওয়া, (৪) বালেগ হওয়া, (৫) নেসাবের মালিক হওয়া, (৬) নিজের মৌলিক প্রয়োজনাদির চাইতে নেসাবের মাল বেশী হওয়া এবং ঋণমুক্ত হওয়া আর (৭) মালিক হওয়ার পর নেসাবের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী। সুতরাং কাফের, গোলাম বা ক্রীতদাস, পাগল ও নাবালেগের মালামালের উপর যাকাত ফরয নয়।

তেমনিভাবে যার কাছে নেসাব অপেক্ষা কম মালামাল থাকে কিংবা নেসাব পরিমাণ মালামাল থাকার সাথে সাথে সে ঋণগ্রস্তও হয় কিংবা মালামাল সারা বছর বাকী না থাকে, তাহলে এসব অবস্থায়ও যাকাত ফরয নয়।

যাকাতের মাল ও নেসাবের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ মালের উপর যাকাত ফরয ?

উত্তর ঃ সোনা-রূপা ও সব রকম ব্যবসায়িক মালামালে যাকাত ফরয।

প্রশ্ন ঃ সোনা-রূপা বলতে এ সবের মুদ্রা-যেমন, আশরাফী, টাকা প্রভৃতি বুঝায়, নাকি অন্য কিছু ?

উত্তর ঃ সোনা-রূপার সমস্ত জিনিসের উপরই যাকাত ফরয। যেমন, আশরাফী, টাকা, অলঙ্কার, পাত্রাদি, জরিযুক্ত লেস প্রভৃতি।

প্রশ্ন ঃ জহরত বা মণি-মাণিক্যের উপর যাকাত ফরয কিনা ?

উত্তর ঃ মণি-মাণিক্য, হিরা-জহরত যদি ব্যবসায়ের জন্য হয়, তবে যাকাত ফরয। আর ব্যবসায়ের জন্য না হলে সেগুলো যত মূল্যবানই হোক যাকাত ফরয নয়। তেমনিভাবে কারো কাছে যদি তামা-পিতল প্রভৃতির পাত্রাদি নেসাব অপেক্ষা অধিক মূল্যেরও হয় কিংবা কোন বাড়ী বা দোকান প্রভৃতি নেসাব অপেক্ষা বেশী মূল্যের হয় এবং তার ভাড়াও

আসে কিংবা সোনা-রূপা ছাড়া অন্য কোন রকম মাল সামানে থাকে; কিন্তু সেগুলো ব্যবসায়ের জন্য না হয়, তবে সেগুলোর কোনটির উপরই যাকাত ফরয হবে না।

প্রশ্ন ঃ কারো কাছে যদি নেসাব পরিমাণ সরকারী নোট থাকে, তবে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ সেগুলোর উপর যাকাত ফরয।

প্রশ্ন ঃ কারো কাছে যদি সামান্য রূপা এবং সামান্য সোনা থাকে; কিন্তু এ দু'টোর মধ্যে কোনটিরই নেসাব পূর্ণ না হয়, তবে তার উপর যাকাত ফরয কিনা ?

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে সোনার মূল্য রূপার সাথে কিংবা রূপার মূল্য সোনার সাথে লাগিয়ে দেখতে হবে– দু'টির মধ্যে কোন একটির নেসাব পূর্ণ হয় কিনা। যদি কোন একটির নেসাব পূর্ণ হয়ে যায়, তবে সেটির হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। আর যদি কোনটির নেসাবই পূর্ণ না হয়, তবে যাকাত ফরয নয়।

প্রশ্ন ঃ কারো কাছে যদি শুধুমাত্র তিন চার তোলা সোনা থাকে এবং তার মূল্য যদি রূপার নেসাবের সমান বা বেশী হয়, কিন্তু রূপার অন্য কোন কিছুই তার কাছে না থাকে– না টাকা, না অলঙ্কার প্রভৃতি, তবে তার উপর যাকাত ফরয হবে কিনা ?

উত্তর ঃ এ অবস্থায় তার উপর যাকাত ফরয নয়।

প্রশ্ন ঃ ব্যবসায়ের মালামাল বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ যে মালামাল বেচে মুনাফা অর্জনের জন্য থাকে, তাই ব্যবসায়ের মালামাল। তা যে কোন রকমই হোক না কেন। যেমন, খাদ্যশস্য, কাপড়-চোপড়, গুড়, জুতা, গৃহসামগ্রী প্রভৃতি।

প্রশ্ন ঃ নেসাব কাকে বলে ?

উত্তর ঃ যেসব মাল-সামানের উপর যাকাত ফরয, শরীঅত সেগুলোর বিশেষ বিশেষ পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে। যখন সে পরিমাণ কারো কাছে পূর্ণ হয়ে যায়, তখনই যাকাত ফরয হয়। আর এ পরিমাণকেই নেসাব বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ রূপার নেসাব কি ?

উত্তর ঃ রূপর নেসাব হল চুয়ান্ন (৫৪) তোলা দুই মাশা ওযনের রূপা। (তোলা বলতে ইংরেজী টাকার ওযন উদ্দেশ্য।)

প্রশ্ন ঃ ৫৪ তোলা ২ মাশা ওযনের রূপার যাকাত কত ?

উত্তর ঃ পূর্ণ পরিমাণের ১/৪০ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেয়া ফরয। সুতরাং ৫৪ তোলা ২ মাশার যাকাত হল ১ তোলা ৪ মাশা ২ রতি রূপা।

প্রশ্ন ঃ সোনার নেসাব কি ?

উত্তর ঃ সোনার নেসাব হল সাত তোলা সাড়ে আট মাশা সোনা। আর এর যাকাত হল ২ মাশা আড়াই রতি সোনা।

প্রশ্ন ঃ বাণিজ্যিক সামগ্রীর নেসাব কি ?

উত্তর ঃ সোনা বা রূপার মাধ্যমে বাণিজ্য সামগ্রীর মূল্য ধরতে হবে। অতঃপর সোনা বা রূপার নেসাব স্থির করে সে হিসেব অনুযায়ী যাকাত পরিশোধ করবে।

যাকাত পরিশোধের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ যাকাত পরিশোধের সঠিক পন্থা কি ?

উত্তর ঃ যে পরিমাণ যাকাত ফরয হবে, তা কোন মুস্তাহেক তথা যাকাত পাবার যোগ্য লোককে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দিয়ে দেবে এবং তাকে মালিক বানিয়ে দেবে। কোন রকম সেবা কিংবা কোন কাজের পারিশ্রমিক বাবদ যাকাত দেয়া জায়েয নয়। অবশ্য যাকাতের মাল দ্বারা যদি ফকীর-মিসকীনের জন্য কোন কিছু কিনে তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তবে তা জায়েয।

প্রশ্ন ঃ যাকাত কখন পরিশোধ করা উচিত ?

উত্তর ঃ যখন নেসাব পরিমাণ মালামালের উপর চাঁদের হিসেবে বছর পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন অবিলম্বে যাকাত পরিশোধ করা কর্তব্য। দেরী করা ভাল নয়।

প্রশ্ন ঃ বছর শেষ হওয়ার পূর্বে যাকাত দিয়ে দিলে জায়েয হবে কিনা ?

উত্তর ঃ নেসাব পরিমাণ মালের মালিক যদি বছর ঘুরার পূর্বে যাকাত দিয়ে দেয়, তবে তা জায়েয।

প্রশ্ন ঃ যাকাত দেয়ার সময় নিয়ত করা জরুরী কিনা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, যাকাত দেয়ার সময় কিংবা অন্তত যাকাতের মালামাল পৃথক করে রাখার সময় এ নিয়ত করা জরুরী যে, আমি এ মালামাল যাকাত বাবদ

দিচ্ছি কিংবা যাকাতের জন্য পৃথক করছি। যাকাতের খেয়াল না করে যদি কাউকে টাকা দেয়ার পর তা যাকাতের হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে যাকাত আদায় হবে না।

প্রশ্ন ঃ যাকে যাকাত দেয়া হয়, তাকে বলে দেয়া জরুরী কি না যে, এগুলো যাকাত সামগ্রী ?

উত্তর ঃ না, তা জরুরী নয়; বরং উপহার-উপঢৌকনের নামে কিংবা কোন গরীবের শিশুকে ঈদী নামে দিয়ে দিলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ বছরান্তে যাকাত দেয়ার পূর্বে যদি মালামাল বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তার হুকুম কি ?

উত্তর ঃ তার যাকাতও তার দায়িত্ব থেকে রহিত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ বছরান্তে যদি সমস্ত মালামাল আল্লাহ্‌র রাহে দিয়ে দেয়া হয়, তবে কি হুকুম ?

উত্তর ঃ তার যাকাতও মাফ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ বছরান্তে যদি সামান্য মালামাল বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা খয়রাত করে দেয়, তবে তার কি হুকুম ?

উত্তর ঃ যে পরিমাণ মালামাল নষ্ট হবে কিংবা খয়রাত করে থাকবে, তার যাকাত রহিত হয়ে যাবে। অবশিষ্টের যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ রূপার যাকাত যদি রূপার দ্বারাই পরিশোধ করে, তবে ওযন গ্রাহ্য হবে, নাকি মূল্য ?

উত্তর ঃ ওযন গ্রাহ্য হবে। যেমন, কারো কাছে একশ' টাকা আছে। বছরান্তে তাকে আড়াই তোলা রূপা দেয়া উচিত। এখন তার ইচ্ছা, সে দু'টি টাকা এবং একটি আধুলি দিলেও পারে কিংবা আড়াই তোলা রূপার একটা টুকরা দিলেও পারে। যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু আড়াই তোলা রূপার টুকরাটির মূল্য যদি দু'টাকা হয়, তখন দু'টাকা দিলে যাকাত আদায় হবে না।

প্রশ্ন ঃ রূপার যাকাত ওয়াজিব হলে অন্য কোন কিছু যাকাত হিসেবে দেওয়া যায় কিনা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, যতটা রূপা যাকাত হিসেবে ওয়াজিব হয়, সে পরিমাণ রূপার মূল্যে অন্য কোন জিনিস, যেমন, কাপড় কিংবা খাদ্যসামগ্রী কিনে দেয়াও জায়েয।

মাসারিফে যাকাত বা যাকাতের খাতসমূহ

প্রশ্ন ঃ যাকাতের মাস্‌রাফ বা ব্যয়খাত বলতে কি বুঝা যায় ?

উত্তর ঃ যাকে যাকাত দেয়ার অনুমতি রয়েছে, তাকেই যাকাতের মাস্‌রাফ বা ব্যয়খাত বলা হয়। মাসারিফ হল মাসরাফের বহুবচন। মাসারিফে যাকাত বলতে সেসব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়, যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয।

প্রশ্ন ঃ মাসারিফে যাকাত কয়টি এবং কি কি ?

উত্তর ঃ এ যুগে মাসারিফে যাকাত বা যাকাতের ব্যয়খাতগুলো হল ঃ (১) ফকীর। অর্থাৎ, এমন ব্যক্তি যার কাছে সামান্য বস্তু-সামগ্রী রয়েছে; কিন্তু তা নেসাব সমান নয়; (২) মিসকীন। অর্থাৎ, এমন লোক যার কোন কিছুই নেই, (৩) ঋণী ব্যক্তি। অর্থাৎ, এমন লোক যার উপর লোকদের এত ঋণ রয়েছে যে, ঋণের পরে তার কাছে নেসাব পরিমাণ মালামাল থাকে না, (৪) মুসাফির। যে সফরের মাঝে দারিদ্রগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তাকে প্রয়োজন পরিমাণ যাকাত দেয়া জায়েয।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী মাদ্রাসাসমূহে যাকাতের সামগ্রী দেয়া জায়েয কিনা ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তালেবে এলমদেরকে যাকাতের সামগ্রী দেয়া জায়েয। আর মাদ্রাসার মুহতামেম সাহেবেদরকে এ শর্তে যে, তারা তালেবে এলমদের জন্য তা ব্যয় করবেন– দিলে কোন ক্ষতি নেই।

প্রশ্ন ঃ কোন্ লোকদেরকে যাকাত দেয়া নাজায়েয ?

উত্তর ঃ যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয় ঃ (১) মালদার বা ধনী ব্যক্তি, যার নিজের উপর যাকাত ফরয কিংবা যার কাছে মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাবের মূল্য পরিমাণ অন্য কোন সম্পদ থাকে। যেমন, কারো কাছে দৈনন্দিনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তামা পিতলাদির পাত্রাদি রয়েছে এবং সেগুলোর মূল্য নেসাব পরিমাণ হয়, তার জন্য যাকাত সামগ্রী গ্রহণ করা হালাল নয়। যদিও সেসব পাত্রাদি থাকার দরুন তার উপরও যাকাত দেয়া ওয়াজিব নয়। (২) সৈয়্যদ ও বনী হাশেম। বনী হাশেম বলতে হযরত হারেস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ও হযরত জা'ফর (রাঃ), হযরত আকীল (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশধর উদ্দেশ্য। (৩) নিজের পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী তা যত উপরের হোক। (৪) পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী তা যত নীচেরই হোক। (৫) স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে

পারে না। (৬) কাফের ও (৭) ধনী ব্যক্তির নাবালেগ সন্তান। এসব লোককে যাকাত দেয়া জায়েয নয়।

প্রশ্ন : কোন্ সব কাজে যাকাতের মাল খরচ করা জায়েয নয়?

উত্তর : যেসব বিষয়ে কোন হকদারকে মালিক বানানো যায় না, সেসবে যাকাতের মাল ব্যয় করা নাজায়েয। যেমন, মৃতের কবর-কাফনে লাগানো, মৃতের ঋণ পরিশোধ করে দেয়া, মসজিদের নির্মাণ বা বিছানাপাতি বা লোটা-বদনা কিংবা পানি ইত্যাদিতে ব্যয় করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন : কারো কাছে যদি যাকাতের নেসাবের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী মূল্যের বাড়ী থাকে এবং তাতে সে নিজে বসবাস করে কিংবা তার ভাড়ায় নিজের জীবিকা নির্বাহ করে; কিন্তু এছাড়া আর কোন সম্পদ তার না থাকে; বরং অভাবী হয়, এমন লোককে যাকাত দেয়া জায়েয কিনা?

উত্তর : জায়েয। কারণ, এ বাড়ীটি তার মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যখন কারো কাছে তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন সম্পদ থাকে এবং তা নেসাব পরিমাণ হয়, তবে তার জন্য যাকাত নেয়া জায়েয নয়।

প্রশ্ন : যদি কোন লোককে যাকাত পাওয়ার যোগ্য মনে করে যাকাত দিয়ে দেয়া হয় এবং পরে জানা যায় যে, সে সৈয়্যদ বা হাশেমী ছিল কিংবা নিজের পিতা, মাতা বা সন্তানদের মধ্যেই কেউ ছিল, তাহলে যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : যাকাত আদায় হয়ে যাবে; পুনরায় দেয়া ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন : কোন্ কোন্ লোকদেরকে যাকাত দেয়া উত্তম?

উত্তর : প্রথমতঃ নিজের আত্মীয়-স্বজন- যেমন, ভাই-বোন, ভাতিজা-ভাতিজী, ভাগ্নে-ভাগ্নী, চাচা-ফুফু, মামা-খালা, শ্বশুর-শাশুড়ী, মেয়ের জামাই প্রভৃতির মধ্যে যারা অভাবগ্রস্ত এবং যাকাতের উপযুক্ত তাদেরকে দেয়ায় অনেক বেশী সওয়াব। তাদের পর নিজের পাড়া-পড়শী কিংবা নিজের শহরের লোকদের মধ্যে যারা বেশী অভাবগ্রস্ত তাদেরকে দেয়া উত্তম। অতঃপর যাকে দিলে দ্বীনের লাভ বেশী হবে, তাকে দেবে যেমন, দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থী বা তালেবে এলম।

সদকায়ে ফিৎরের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ সদকায়ে ফিৎর কাকে বলে ?

উত্তর ঃ ফিৎর অর্থ হল রোযা খোলা বা রোযা না রাখা। আল্লাহ্ তা'আলা নিজের বান্দাদের উপর একটি সদকা ধার্য করেছেন, যা রমযান শরীফ শেষ হওয়ার পর রোযা খুলে যাওয়ার খুশী ও শুকরিয়াস্বরূপ আদায় করবে। তাকেই সদকায়ে ফিৎর বলা হয়। আর এ রোযা খোলার আনন্দ উদযাপনের দিন হওয়ার দরুন রমযান শরীফের পরবর্তী ঈদকে বলা হয় ঈদুল ফিৎর।

প্রশ্ন ঃ সদকায়ে ফিৎর কাদের উপর ওয়াজিব ?

উত্তর ঃ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক প্রত্যেক আযাদ মুসলমানের উপরই সদকায়ে ফিৎর ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ সদকায়ে ফিৎর ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে নেসাব শর্ত, তা কি সে নেসাবই যা যাকাতের নেসাব বাবদ বলা হয়েছে, নাকি কোন পার্থক্য আছে ?

উত্তর ঃ যাকাতের নেসাব ও সদকায়ে ফিৎরের নেসাবের পরিমাণ একই বটে– যেমন, ৫৪ তোলা ২ মাশা রূপা বা তার মূল্য; কিন্তু যাকাতের নেসাব ও সদকায়ে ফিৎরের নেসাবের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সোনা-রূপা বা বাণিজ্য সামগ্রী হওয়া জরুরী আর সদকায়ে ফিৎর ওয়াজিব হওয়ার জন্য এ তিন প্রকার সামগ্রীর কোন বৈশিষ্ট্য নেই; বরং এর নেসাবে যে কোন রকম পণ্য বা মালামাল হিসাবে ধরা হবে। অবশ্য তা মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং ঋণ বহির্ভূত হওয়া উভয় নেসাবেই শর্ত।

কাজেই কারো কাছে যদি নিজের ব্যবহারের কাপড়-চোপড়ের অতিরিক্ত কাপড়-চোপড় থাকে কিংবা দৈনন্দিনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তামা-কাঁসা, পিতল বা চিনা মাটি ও কাঁচের বাসন-কোষণ ও গৃহ সামগ্রী থাকে কিংবা কোন খালি বাড়ী পড়ে থাকে এবং কোন দ্রব্য-সামগ্রী তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে এবং সেগুলোর মূল্য নেসাবের সমান বা তার চেয়েও বেশী হয়ে যায়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয নয়; কিন্তু সদকায়ে ফিৎর ওয়াজিব। সদকায়ে ফিৎরের নেসাব বছর ভর থাকাও শর্ত নয়; বরং ঈদের দিন নেসাবের মালিক হলেও সদকায়ে ফিৎর দেয়া ওয়াজিব।

প্রশ্ন : সদকায়ে ফিৎর কার পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব ?

উত্তর : প্রত্যেক নেসাবের মালিক ব্যক্তিকে নিজের পক্ষ থেকে ও নিজের নাবালেগ সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিৎর দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু নাবালেগদের যদি নিজস্ব সম্পদ থাকে, তবে সে সম্পদ থেকে আদায় করবে।

প্রশ্ন : কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি রোযা রাখেনি, তার উপর সদকায়ে ফিৎর ওয়াজিব নয়, কথাটা শুদ্ধ না ভুল ?

উত্তর : ভুল। নেসাবের মালিক প্রত্যেকের উপরই ওয়াজিব, সে রোযা রাখুক বা না রাখুক।

প্রশ্ন : সদকায়ে ফিৎর ওয়াজিব হওয়ার সময় কোন্‌টি ?

উত্তর : ঈদুল ফিৎরের দিন সুবহে সাদেক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সদকায়ে ফিৎর ওয়াজিব হয়ে যায়। কাজেই যে লোক সুবহে সাদেকের পূর্বে মরে যাবে, তার সম্পদ থেকে সদকায়ে ফিৎর দেয়া যাবে না। পক্ষান্তরে যে শিশু সুবহে সাদেকের পূর্বে জন্মাবে তার পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিৎর আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন : ঈদের দিনের পূর্বে রমযান শরীফেই যদি সদকায়ে ফিৎর দিয়ে দেয়, তবে তা জায়েয কিনা ?

উত্তর : জায়েয।

প্রশ্ন : সদকায়ে ফিৎর আদায় করার উত্তম সময় কোন্‌টি ?

উত্তর : ঈদের দিন ঈদের নামাযে যাবার পূর্বে আদায় করা উত্তম। নামাযের পরে আদায় করাও জায়েয। যতক্ষণ পর্যন্ত আদায় না করবে, তার উপর ওয়াজিব থেকেই যাবে, তা যতদিনই কেটে যাক।

প্রশ্ন : সদকায়ে ফিৎরের হিসাবে কোন্ কোন্ বস্তু কি পরিমাণে দেয়া ওয়াজিব ?

উত্তর : সদকায়ে ফিৎরে সব রকম খাদ্যশস্য ও তার মূল্য দেয়া জায়েয। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, গম বা তার আটা বা ছাতু দিতে হলে মাথাপিছু পৌনে দু'সের দিতে হবে। (সের বলতে ইংরেজী টাকার আশি টাকার সমান ওযন।)

আর যব, তার আটা বা ছাতু দিলে সাড়ে তিন সের দেবে। আর যব ও গম ছাড়া অন্য কোন খাদ্যশস্য যেমন, চাল, বাজরা, জোয়ার প্রভৃতি দিতে চাইলে পৌনে দু'সের গমের মূল্য কিংবা সাড়ে তিন সের যবের মূল্যে যে পরিমাণ (চাল,

বাজরা ও জোয়ার প্রভৃতি) খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে ততটুকু দিতে হবে। আর যদি মূল্য দিতে হয়, তাহলে পৌনে দু'সের গম বা সাড়ে তিন সের যবের মূল্য দেবে।

প্রশ্ন ঃ একজনের ফিৎরা একই ফকীরকে দিতে হবে, নাকি অল্প অল্প করে কয়েকজন ফকীরকে দেয়াও জায়েয ?

উত্তর ঃ কয়েকজন ফকীরকে দেয়াও জায়েয। তেমনিভাবে কয়েক জনের সদকা একজন ফকীরকে দেওয়াও জায়েয।

প্রশ্ন ঃ সদকায়ে ফিৎর কাদেরকে দেয়া উচিত ?

উত্তর ঃ যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয তাদেরকে সদকায়ে ফিৎর দেয়াও জায়েয। যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়, তাদেরকে সদকায়ে ফিৎর দেয়াও জায়েয নয়।

প্রশ্ন ঃ যাদের উপর সদকায়ে ফিৎর ওয়াজিব, তারা যাকাত কিংবা সদকায়ে ফিৎর নিতে পারে কিনা ?

উত্তর ঃ নিতে পারে না। তাছাড়া কোন ফরয বা ওয়াজিব সদকা এ ধরনের লোকের নেয়া জায়েয নয় যাদের কাছে সদকায়ে ফিৎরের নেসাব বিদ্যমান।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত